অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

দুধসায়রের দ্বীপ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. পুকুরটার নাম দুধের সর ... 2
২. বিদ্যাধরপুর গাঁয়ের একটু তফাতে... 9
৩. দারোগা মদন হাজরা... 20
৪. ক্ষান্তমণি সকালে বাগানে গিয়েছিল ... 28
৫. সন্ধেবেলা শিবমন্দিরের চাতালে ... 38
৬. ফটিকবাবুর বারান্দাটা বেশ চওড়া... 48
৭. আজ পুটু খাসনবিশের সঙ্গে ... 58
৮. গাঁয়ের লোকজন এসে রাজবাড়িতে হাজির ... 70

১. পুকুরটার নাম দুধের সর

পুটু বলল, “আচ্ছা, এই পুকুরটার নামই কি দুধের সর?” খাসনবিশ চোখ কপালে তুলে বলল, “পুকুর! এই সমুদুরের মতো বিরাট জিনিসকে তোমার পুকুর বলে মনে হচ্ছে? শহুরে ছেলেদের দোষ কী জানো তো! তারা সব জিনিসকে ছোট করে দেখে। তারা পাহাড়কে বলে ঢিবি, বোয়ালমাছকে বলে মাগুরমাছ, বুড়োমানুষকে ভাবে খোকা। ওই হল তোমাদের দোষ।”

পুটু অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু ক্ষান্তমাসি যে কালকেই বলছিল, যাই দুধপুকুরে চ্যান করে আসি।”

“ক্ষ্যান্ত? তার কি মাথার ঠিক আছে? সে সুয্যিকে চাঁদ বলে মনে করে, মাঝরাত্তিরকে মনে করে বেহান বেলা, চোরকে ভাবে দারোগাবাবু। তার গুণের কথা আর বোলো না।”

“তা হলে এটা পুকুর নয়?”

“কক্ষনো নয়, কস্মিনকালেও নয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র জীবনে ছোটখাটো কাজ করেননি কখনও, ছোট কাজ করতে ভারী ঘেন্না করতেন। তাঁর কথা ছিল, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। কুমড়োর সাইজের রসগোল্লা খেতেন, লাউয়ের সাইজের পান্তুয়া। তাঁর তরোয়ালখানার ওজন ছিল প্রায় আধ মন।”

“এঃ, অত বড় তলোয়ার নিয়ে কেউ যুদ্ধ করতে পারে?”

“যুদ্ধ! যুদ্ধ করার দরকারটা কী? প্রতাপচন্দ্র নিজেও তলোয়ারটা তুলতে পারতেন না। কথাটা হল, উনি সবসময়ে বড়বড় কাজ করতে ভালবাসতেন। শুনেছি একবার ঘুড়ি

ওড়ানোর শখ হওয়াতে কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট একখানা ঘুড়ি তৈরি করিয়েছিলেন আর পিপের সাইজের লাটাই।”

“ও বাবা! সে-ঘুড়ি ওড়াল কে?”

“কেউ না। ঘুড়ি মোটে আকাশে ওড়েইনি। কিন্তু তাতেও রাজা প্রতাপের নামডাক খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই যে সমুদুরের মতো জলাশয় দেখছ এও রাজা প্রতাপের এক কীর্তি।”

“কিন্তু দুধের সর নাম হল কেন?”

“দুধের সর নয় বাবা, দুধসায়র। সায়র মানে সাগরই হবে বোধ হয়। আর দুধের ব্যাপারটাও সত্যি। প্রতাপচন্দ্র সায়র তৈরি করলেন বটে, কিন্তু তাতে প্রথমটায় জল ওঠেনি। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন মা-চামুণ্ডা একটা দুধের পুকুরে চান করতে করতে বলছেন, “ওরে প্রতাপ, কিসের জোরে তোর এত বিষয়সম্পত্তি, এত পয়সাকড়ি তা ভেবে দেখেছিস? মাটি থেকেই না তোর এত আয় হয়। তা মাটিকে কি কিছু দিস হতভাগা? ভাল চাস তো সায়রে ঘড়া-ঘড়া দুধ ঢাল। দুধ পেলে বসুন্ধরা খুশি হয়ে জল ছাড়বে। নইলে ওই দহে কস্মিনকালেও জল হবে না। স্বপ্নাদেশ পেয়ে প্রতাপচন্দ্রের হুকুমে তিন হাজার গয়লা ঘড়া-ঘড়া দুধ ঢালতে লাগল। সে একেবারে থইথই দুধ।”

“এ মা, এত দুধ যে নষ্ট হল!”

খাসনবিশ চোখ কপালে তুলে বলল, “নষ্ট কী গো? তোমরা শহুরে ছেলেরা বড্ড সায়েন্স শিখে যাও অল্প বয়সে। দুধ নষ্ট হবে

কেন? মাটিতে দুধ গিয়ে কীরকম সার হল বলল। তাইতেই তো আশপাশের জমি সব দ্বিগুণ ফলন্ত হয়ে উঠল। আর দুধপুকুরেও বান ডাকার মতো হু-হুঁ করে মাটি খুঁড়ে জল বেরিয়ে এল।”

“পুকুরে দুধ ঢালতেই জল বেরিয়ে এল? হিঃ হিঃ, তা হলে নিশ্চয়ই গয়লারা দুধে খুব জল মিশিয়ে দিয়েছিল!”

“অ্যাঁ! বলে কী রে খোকা? কার ঘাড়ে ক’টা মাথা যে দুধে জল মেশাবে? কিন্তু তুমি মহা বিচ্ছু ছেলে দেখছি পুটুবাবু। এইটুকু বয়সে যে কেউ এত নাস্তিক হয় তা জানা ছিল না বাপু।”

“নাস্তিক মানে কী খাসনবিশদাদা?”

“নাস্তিক মানে হচ্ছে যারা কিছু মানেটানে না। সব জিনিস আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়। তুমি নাস্তিক হবে নাই বা কেন? তোমার বাপটাই তো একটা আস্ত নাস্তিক।”

“তুমি কেমন করে জানলে যে বাবা নাস্তিক?”

“জানব না? তাকে যে এই এতটুকু বয়স থেকে কোলে কাঁখে করে বড় করেছি। আমার বড্ড ন্যাওটা ছিল। এখন ভারী চশমা চোখে এঁটে মোটা-মোটা বই পড়ে বটে, কিন্তু ছেলেবেলায় মহা বিচ্ছু ছিল। কিছু বললেই তোমার মতো চোখাচোখা প্রশ্ন করত। তখন থেকেই নাস্তিক।”

“না, বাবা মোটেই নাস্তিক নয়। বাবা তো বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, নাস্তিক হবে কেন?”

“ওই হল বাপু। বিজ্ঞান কি আর ভাল জিনিস? বিজ্ঞান অ্যাটম বোমা বানায়, ভগবানের নামে নিলেমন্দ করে, এঁটোকাঁটা মানে না।”

“হিঃ হিঃ, তুমি যে একটা কী না খাসনবিশদাদা! আচ্ছা শোনো, তোমরা কি বাতাসা দিয়ে দুধ খাও?”

“ও মা, ও কী কথা? হঠাৎ বাতাসা দিয়ে দুধ খাওয়ার কথা উঠছে কেন?”

“ওই যে দ্যাখো, দুধের সরের মাঝখানে ঠিক বাতাসার মতো একটা জিনিস ভাসছে না?”

খাসনবিশ একগাল হেসে বলল, "তা বটে ঠিক। ওটা দেখতে বাতাসার মতোই বটে। তবে দূর থেকে বাতাসা বলে মনে হলেও ওটি কিন্তু একখানা দ্বীপ। তা ধরো দশ বারো বিঘে জমি তো আছেই। ওটা ছিল প্রতাপরাজার বাগানবাড়ি।"

"কই, বাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না!"

"না বাপু, এত দূর থেকে কি আর অত ঠাহর করা যায়? তা ছাড়া বড় বড় গাছ আর আগাছায় সব ঢেকে গেছে। বাড়িরও বড্ড ভগ্নদশা, সাপখোপের আড্ডা।"

"কেউ যায় না ওখানে?"

"নাঃ। কে যাবে? গিয়ে হবেটাই বা কী? আগে কেউ-কেউ সোনাদানা মোহর কুড়িয়ে পাবে বলে লোভে-লোভে যেত। আজকাল আর কেউ যায় না। খামোখা হয়রান হয়ে লাভটা কী?"

"কিন্তু পিকনিক করতে যেতে পারে তো!"

"ওসব পিকনিক-টিকনিক এখানে হয় না। এ গাঁ-গঞ্জ জায়গা।"

পুটু বলল, "কিন্তু আমরা যদি যাই?" খাসনবিশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "না যাওয়াই ভাল। সাপখোপ ছাড়াও অন্যসব জিনিস আছে।"

"কী জিনিস খাসনবিশদাদা?" খাসনবিশ মাথা চুলকে বলল, "তুমি তো আবার নাস্তিক। তোমাকে বলেও লাভ নেই।"

"তুমি নিশ্চয়ই বলবে, ওখানে ভূত আছে!"

"বলব বলব করছিলাম, তা তুমিই যখন বলে দিলে তখন সত্যি কথাটা স্বীকার করাই ভাল। এখানে ইদানীং ভূতের উৎপাত হয়েছে বলে শুনেছি।"

"আমি ভূতপ্রেত মানি না।"

খাসনবিশ খিঁচিয়ে উঠে বলল, "তা মানবে কেন? দু'পাতা সায়েন্স পড়ে তোমরা সব গোল্লায় গেছ। তবে কুনকে তো আর মিছে কথা বলার ছেলে নয়!"

"কুনকে আবার কে?"

"কুণ্ডুবাড়ির ছেলে কনিষ্ক কুণ্ডু, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। সে আর পালপাড়ার ভোলা দু' জনেই স্বচক্ষে দেখে এসেছে।"

"কী দেখেছে খাসনবিশদাদা?"

"তা আর তোমাকে বলে কী হবে? বিশ্বাস তো আর করবে!"

"ভূতের গল্প শুনতে যে আমার ভীষণ ভাল লাগে!"

"গল্প? হুঁ, তোমার কাছে গালগল্প হলেও যারা দেখেছে তাদের কাছে তো নয়।"

"না বললে কিন্তু তোমার তামাক-টিকে চুরি করে লুকিয়ে রাখব।"

চোখ কপালে তুলে খাসনবিশ বলে, "ও বাবা, তুমি যে দেখছি গুটকের চেয়েও বেশি বিচ্ছু!"

"গুটকেটা তো হাঁদারাম, সাইকেল চালাতে পারে না।"

"তা না পারুক, গুটকে সাঁতার জানে। তুমি জানো?"

"ও আমি দু'দিনে শিখে নেব। এবার গল্পটা বলল। কুনকে আর ভোলা কী দেখেছিল?"

"কুনকে খুব হামাদ ছেলে, ভয়ডর বলতে কিছু নেই, বুঝলে!"

"সে আমারও নেই। তারপর বলো।"

"কথাই তো কইতে দাও না, কেবল ফুট কাটো। হ্যাঁ, তা হয়েছে কী গতবার শীতের শুরুতেই তারা দুজন এক দুপুরবেলা একটা ডিঙি নৌকো বেয়ে ওই দ্বীপে গিয়েছিল।"

"ওরা নৌকো বাইতে পারে বুঝি?"

"পারবে না? গাঁয়ের ছেলেরা সব পারে। তোমাদের শহুরে ছেলেদের মতো তো নয়।"

"আমিও দু'দিনে শিখে নেব। তারপর বলো।"

"তা তারা গিয়েছিল বেজির বাচ্চা খুঁজতে।"

"ওখানে বেজি আছে বুঝি?"

"প্রতাপরাজার আমলে মেলাই ছিল। উনি খুব বেজি পছন্দ করতেন। তা সেইসব বেজি এখন ঝাড়েবংশে বেড়েছে হয়তো।"

"এই যে বললে ওখানে সাপখোপের আড্ডা! বেজিরা তো সাপগুলোকে মেরেই ফেলবে।"

"ওরে বাবা, জঙ্গলের নিয়ম কি আর আমাদের মত? সেখানে সবাই থাকে। ঝগড়াঝাঁটি খুনখারাপি হয়, আবার থাকেও একসঙ্গে। সাপও আছে, বেজিও আছে। তা সেইখানে গিয়ে যখন জঙ্গলের মধ্যে দু'জনে বেজি খুঁজছিল সেই সময়ে হঠাৎ দেখতে পায় একটা খুব লম্বা লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"

"সেটাই কি ভূত?"

"আঃ, ফের কথা বলে! হ্যাঁ বাপু, সেটাই ভূত।"

"যাঃ, লম্বা লোক হলেই বুঝি ভূত হয়? তা হলে আমার নসু কাকাও তো ভূত।"

"ওরে বাপু, লম্বার তো একটা বাছবিচার আছে! তিন-চার হাত লম্বা হলে কথা ছিল না, এ-লোকটা যে সাত-আট হাত লম্বা।"

"তার মনে কত ফুট?"

"তা ধরো দশ বারো ফুট তো হবেই।"

"গুল মারছ খাসনবিশদাদা।"

"এইজন্যই তোমাকে কিছু বলতে চাই না।"

"দশ বারো ফুট লম্বা কি মানুষ হয়?"

"মানুষ হলে তবে তো?"

"তা সে-লোকটা কী করল?"

"কী আবার করবে? লোকটা একটা নারকোল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে ছিল। ওরা কি আর কিছু দেখেছে? ওরকম ঢ্যাঙা একটা লোককে দেখেই পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এসে ডিঙিতে উঠে পালিয়ে এসেছে।"

"দুপুরবেলা?" "হ্যাঁ, ঠিক দুপুরবেলা। কথাতেই তো আছে, ঠিক দুকুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা।"

২. বিদ্যাধরপুর গাঁয়ের একটু তফাতে

বিদ্যাধরপুর গাঁয়ের একটু তফাতে জঙ্গলের মধ্যে বুড়ো শিবের পুরনো মন্দির। মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে তাতে অশ্বত্থের চারা উঁকি মারছে, দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ, তক্ষকের বাসা। আজকাল লোকজনও বিশেষ আসে না। শুধু জগাপাগলা আর ভুলু কুকুর রোজ সন্ধেবেলা হাজির থাকে।

প্রৌঢ় পুরোহিত রসময় চক্রবর্তী সন্ধ্যাপূজা সেরে বেরিয়ে এসে দেখেন জগাপাগলা চাতালের ওপর নিজের ঝোলাটাকে তাকিয়ার মতো করে আধশোওয়া হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। আর চাতালের সিঁড়ির নীচে ভুলু মহা আরামে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছ।

রসময় চক্রবর্তী লণ্ঠনটা পাশে রেখে চাতালে বাবু হয়ে বসলেন। জগাপাগলার সঙ্গে রোজই তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়। লোকটা পাগল হলেও তাকে খারাপ লাগে না চক্কোত্তি মশাইয়ের।

শরৎকাল এসে গেছে। এ-সময়ে সন্ধের পর একটু হিম পড়ে। জগার গায়ে একটা সবুজ রঙের গরম কাপড়ের কোট, আর পরনে কালো পাতলুন। রসময় লক্ষ করলেন, পোশাকটা বেশ নতুন।

“আজ কী নিয়ে ভাবনায় পড়লে হে জগা? বড্ড তন্ময় দেখছি যে!”

জগা সোজা হয়ে বসে গোঁফদাড়ির ফাঁক দিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, “আজ্ঞে, বড় সমস্যায় পড়ে গেছি।”

“কী নিয়ে সমস্যা?”

“আজ্ঞে, খিচুড়ি নিয়ে।”

"খিচুড়ি? সে তো ভাল জিনিস। সমস্যাটা কোথায়?"

"সমস্যা আছে। ধরুন চালেডালে মিশিয়ে সেদ্ধ করলে তো খিচুড়ি হয়, না কি?"

"তা বটে।"

"কিন্তু ডালভাত মাখলে তো তা হচ্ছে না।"

"না, তা হচ্ছে না।"

"ওইখানেই তো সমস্যা। চালেডালে সেদ্ধ করলে খিচুড়ি, আর চাল আলাদা ডাল আলাদা সেদ্ধ করলে ডালভাত, এটা কেন হচ্ছে বলুন তো ঠাকুরমশাই?"

"ও বাবা, এ তো জটিল প্রশ্ন দেখছি।"

"খুবই জটিল। যত ভাবছি তো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কেউই কোনও সমাধান দিতে পারছে না। আপনি তো মেলাই শাস্ত্রটাস্ত্র জানেন, আপনি বলতে পারেন না?"

"না বাপু, শাস্ত্রে খিচুড়ির কথা পাইনি।"

"সেইটেই তো মুশকিল, সায়েন্সে খিচুড়ির কথা আছে মনে করে গোবিন্দর কাছে গিয়েছিলুম। তা সে বলল, খিচুড়িও আসলে ডালভাতই। শুনে এমন রাগ হল! এই বিদ্যে নিয়ে গোবিন্দ নাকি আবার কলেজে সায়েন্স পড়ায়। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।"

"তা বাপু, খিচুড়ির কথাই শুধু ভাবলে চলবে কেন? ধরো দুধে চালে সেদ্ধ করলে পায়েস, আবার দুধেভাতে মাখলে দুধভাত। এটাই বা কেমন করে হচ্ছে?"

ভারী বিরক্ত হয়ে জগা বলল, "আহা, খিচুড়ির কথাটাই আগে শেষ হোক, তবে না পায়েসের কথা! আলটপকা খিচুড়ির মধ্যে পায়েস এনে ফেললে একটা ভজঘট্ট লেগে যাবে না?"

রসময় মাথা নেড়ে বললেন, "তা বটে, তা হলে খিচুড়ির কথাটাই শেষ করো বাপু, তারপর বাড়ি যাই।"

জগা বলল, "বাড়ি যাবেন যান, কিন্তু তা বলে খিচুড়ির কথাটা এখানেই শেষ করা যাচ্ছে না। এ-নিয়ে আরও ভাবতে হবে।"

সিঁড়ির নীচে ভুলু ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ একটু ভুকভুক আওয়াজ করল।

রসময় উঠতে-উঠতে বললেন, "না, আর রাত করা ঠিক হবে। মোহনপুরার জঙ্গলে নাকি বাঘের উৎপাত হয়েছে। জঙ্গলটা তো বেশি দূরেও নয়।"

জগা দাড়িগোঁফের ফাঁকে একছটাক হেসে বলল, "বাঘের খবরে ভয় পেলেন নাকি ঠাকুরমশাই?"

"বাঘকে ভয় না খায় কে বাপু?"

জগা মাথা নেড়ে বলল, "আমারও ভয় ছিল খুব। তবে নিত্যহরি কবরেজ অয়স্কান্তবাবুর বাতব্যাধির জন্য কী একটা ওষুধ বানাবেন বলে বাঘের চর্বি খুঁজছেন, তা আমি সেদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলুম, বাঘের চর্বি তো আর হাটে-বাজারে পাওয়া যাবে না, তা দামটা কীরকম দিচ্ছেন? নিত্যহরি কবরেজ পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বলল, "বাপু রে, জোগাড় করে যদি দিতে পারিস তা হলে প্রতি সের পাঁচ হাজার টাকা দর দেব, ওই দর শুনেই ভয়ডর চলে গেল, সেই থেকে আমি জুতসই একটা বাঘ খুঁজে বেড়াচ্ছি। চর্বি তো নিত্যহরি নেবেই, বাঘের ছালেরও নাকি অনেক দাম, তারপর নখ-দাঁত সবই নাকি ভাল দামে বিক্রি হয়। একটা বাঘ জোগাড় হলে এখন দিনকতক বেশ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাওয়া যায়, কী বলেন?"

"তা হলে তো মোহনপুরার বাঘটার কপাল খারাপই বলতে হয়। তা বাপু, বাঘটাকে মারবে কী দিয়ে? শুধু হাতে নাকি?"

জগা গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না, অন্তর আছে।"

"বটে! তা হলে তো নিশ্চিন্ত। তা অন্তরটা কী? বন্দুক নাকি?"

খিকখিক করে খুব হাসল জগা, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "বন্দুক আবার একটা অন্তর!"

"তবে কি কামান?"

"সে আছে একটা জিনিস, বাঘ মারার অস্তর কিনব বলে শীতলাতলার হাটে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলুম এই শনিবার, তা বাঘ মারব শুনে সবাই হাসে, কেউ মোটে আমলই দেয় না, আজকাল ফচকে লোকের সংখ্যা ক্রমেই বড় বাড়ছে, লক্ষ করেছেন কি ঠাকুরমশাই?"

"তা আর বলতে!"

"তাই বড্ড দমে গিয়েছিলুম। একজন তো বলেই ফেলল, 'ও জগা, তুমি যে বাঘ মারতে চাও এ-খবরটা যদি বাঘের কানে পৌঁছে দিতে পারে তা হলে আর চিন্তা নেই। বাঘ হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে নিজেই মরে যাবে।' বলুন তো ঠাকুরমশাই, এসব কথা শুনলে কার না রাগ হয়?"

"হ্যাঁ, তা রাগ তো হতেই পারে।"

"হরিখুড়ো কী বলল জানেন? বলল, বাঘ মারবে কী হে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। কথায় বলে মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার, বাঘ মারবে কোন দুঃখে! মারলে গণ্ডার মারো।"

"এ তো হরিখুড়োর বড় অন্যায় কথা। গণ্ডারের চাইতে বাঘই। বা কম যায় কিসে!"

"সেকথা আর কে বুঝছে বলুন, শ্যামাপদবাবু তো আর এক কাঠি সরেস। বললেন কি, ওহে জগাভায়া, বাঘকে মারতে যাবে কোন দুঃখে? জ্যান্ত বাঘের যে অনেক বেশি দাম! এই তো নবীন সাহা লোহার কারবার করে সদ্য বড়লোক হয়েছে, হাতে অঢেল পয়সা।

কুকুর, বেড়াল, গোরু, ঘোড়া পুষে অরুচি ধরেছে। এ বার বাঘ পোর শখ। লাখ টাকা দিয়ে কিনে নেবে। তুমি শুধু ধরে দাও।”

“বটে! ঠাট্টাই করল নাকি?”

“তা কে জানে! নবীনের পয়সা আছে, কথাটা মিথ্যে নয়। তবে ঠাকুরমশাই, কথাটা শুনে নিমাই যা বলল তা একেবারে ধ্যাষ্টামো। বলল কি, বাঘ ধরা তো সোজা ব্যাপার, হুইল বঁড়শিতে একটা পাটা গেঁথে ঝুলিয়ে দিয়ে গাছের ওপর বসে থাকো। বাঘ এসে কপাত করে পাঁটাকে গিললেই গেঁথে তুলে ফেলবে।’ শুনুন কথা, বাঘ যেন পুকুরের মাছ! বাঘকে কি অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ভাল?”

“উঁহু, উঁহু, মোটেই ভাল নয়। ওতে বাঘ আরও কুপিত হয়ে

পড়েন, তা হলে তোমাকে নিয়ে হাটের মধ্যে একটা শোরগোলই পড়ে গিয়েছিল বোধ হয়?”

“যে আজ্ঞে, মেলা লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছিল। অমন একটা গুরুতর কথায় যে লোকে এমন হাসাহাসি করতে পারে তা জন্মে দেখিনি!”

“অন্যায় কথা, খুবই অন্যায় কথা।”

“আজ্ঞে, এইজন্যই তো দেশটার উন্নতি হল না।”

“তা যা বলেছ!”

“শুধু বামাচরণবাবুর মতো লোক দু-একজন আছে বলেই যা একটু ভরসা।”

রসময় অবাক হয়ে বলেন, “বামাচরণবাবুটা আবার কে?”

“তাঁকে আমিই কি চিনতুম নাকি? শীতলাতলার হাটেতেই চেনা হল। বড্ড ভাল লোক। সাঁঝের মুখে যখন ফিরে আসছি তখনই হঠাৎ লম্বানা একটা লোক এসে কাঁধে হাত দিয়ে খুব হাসি-হাসি মুখ করে বলল, ‘জগাভায়া কি কিছু খুঁজছ নাকি?’ আমি বললুম, আর বলবেন না মশাই, একটা অস্তর জোগাড় করতে এসে কী হেনস্থাটাই হল!’ তখন উনি বললেন, ‘সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি, আমি এই পাশের গাঁয়েই থাকি, নাম বামাচরণ মিত্তির, তোমাকে বিলক্ষণ চিনি। সত্যি বলতে কী, তোমার মতো বুকের পাটাওলা লোক দুটি দেখিনি। বাঘটা আমাদের গাঁয়েও উৎপাত করছে খুব। পরশু রাতেই তো হেমবাবুর গোরুটা মারল, কিন্তু কেউই বাঘটা মারার জন্য কিছু করছে না। দারোগাবাবু সদাশিব আর শিকারি নাদু মল্লিকের ভরসায় সবাই বসে আছে। তা তারাও তো বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। দারোগা সদাশিব নাকি আজকাল গজল শিখছেন, গান নিয়েই ব্যস্ত। আর নাদু মল্লিকের নতুন নাতি হয়েছে। সেই নাতি নিয়েই আহ্লাদে মেতে আছেন, বন্দুক ছুঁয়েও দেখেন না। এখন ভরসা তুমি। কথাটা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলুম। হ্যাঁ, এই একটা বিবেচক লোক, তো বললুম, “বাঘ মারব কিন্তু অস্তর কই? শুধু হাতে তো আর বাঘ মারা যায় না মশাই।’ তখন বামাচরণবাবু আমার কানে কানে বললেন, “অস্তরের অভাব হবে না, অভাব তো শুধু শিকারির, আমি তোমাকে মোক্ষম অস্তর দেব।”

“তা দিল নাকি অস্তর?”

খিকখিক করে হেসে জগা বলল, “দেয়নি আবার!”

রসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বললেন, “দিয়েছে! তা কী অস্তর দিল?”

“সে আর আপনার শুনে কাজ নেই।”

বামাচরণ যে-ই হোক, পাগলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়াটা যে ভাল হয়নি, এটা নিশ্চয়ই। রসময় উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, “দেখো বাপু, জিনিসটা সামলে রেখো, বাঘ মারতে গিয়ে আবার মানুষ মেরে বোসো না।”

“আজ্ঞে না, সে-ভয় নেই। মারার মতো মানুষই বা পাব কোথায়? চারদিকে যাদের দেখছি সব তো আধমরা মানুষ। এদের আর মেরে হবে কী?”

রসময় বললেন, “তা অবশ্য খুব ঠিক কথা, তা অস্তরটা কি একেবারে বিনি মাগনা-ই দিল নাকি? পয়সাকড়ি চাইল না?”

“আজ্ঞে না, তবে কথা আছে।”

“কী কথা?”

“অস্তরের জন্য পয়সা দিতে হবে না বটে, কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে।”

“খেত-টেত কোপাতে হবে নাকি?”

“ওসব নয়। ছোট কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি, এই তো সেদিন ভূপতি চাটুজ্যে তার গোয়াল পরিষ্কার করাল, সারা দিনমান উদয়াস্ত খেটে গোয়ালঘরখানাকে তাজমহল বানালুম, কিন্তু কী জুটল জানেন? তিনটে টাকা, একথালা পান্তা আর একছড়া তেঁতুল, একটু গুড় চেয়েছিলুম, তাইতে চাটুজ্যেগিন্নি এমন খ্যাঁক করে উঠল! না মশাই, ছোটখাটো কাজ আর নয়, বড্ড ঘেন্না ধরে গেছে। নগেন পালের মেয়ের বিয়েতে কম খেটেছি মশাই? বাজার থেকে গন্ধমাদন মাল টেনে আনা, ম্যারাপ বাঁধার জোগালি খাটা, ঝাঁটপাট দেওয়া, জল তোলা, কী জুটেছিল জানেন? সবার শেষে খেতে দিল একটা ঘাট আর ভাত। বলল, সব জিনিস ফুরিয়ে গেছে। হাতে মোটে পাঁচটি টাকা গুঁজে দিল, ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছোট কাজ কি ভদ্রলোকের পোষায়?”

“অতি ন্যায্য কথাই বলেছ বাপু। ওসব কাজ তোমাকে মানায়ওনা, তা একাজটা বেশ মানানসই পেয়েছ তো?”

জগা ঘাড় কাত করে বলল, “দিব্যি কাজ, একখানা জিনিস শুধু দুধসায়রের দ্বীপে রেখে আসতে হবে।”

বিস্মিত রসময় বলে উঠলেন, "বটে! তা জিনিসটা কী?"

"বলা বারণ, তবে পাঁচ কান যদি না করেন তো বলতে পারি।"

"পাঁচ কান করতে যাব কোন দুঃখে?"

"তা হলে বলি, রাজা প্রতাপের একখান শূল আছে, জানেন তো!"

"কে না জানে! প্রতাপরাজার শূল বিখ্যাত জিনিস। দেড় মন ওজন।"

"সেইটেই।" রসময় চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলো কী হে! রাজা প্রতাপের শুল সরাবে, তোমার ঘাড়ে ক'টা মাথা? হরুয়া পালোয়ান

আর দুই ছেলে যখের মতো রাজা প্রতাপের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, তাদের মতো লেঠেল তল্লাটে নেই, তার ওপর তাদের দলবল আছে, তারা সব রাজা প্রতাপের খাস তালুকের প্রজা। সেই আদিকাল থেকে বংশানুক্রমে রাজা প্রতাপের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, তোমার প্রাণটা যে যাবে হে!"

একটু কাঁচুমাচু হয়ে জগা বলল, "সেইটেই যা মুশকিল, তা অস্তর দেখালে ভয় পাবে না?"

"অস্তর দেখাবে? কী অস্তর তাই তো বুঝলুম না!"

"এই যে!" বলে ঝোলায় হাত পুরে একখানা পিস্তল গোছের জিনিস বের করল জগা। তারপর খিকখিক করে হেসে বলল, "আজ্ঞে এসব খুব সাজ্ঘাতিক জিনিস।"

সাজ্ঘাতিক কিনা রসময় তা জানেন না, তবে জিনিসটা দেখে তাঁর খেলনা পিস্তল বলেই মনে হল, একটু হেসে বললেন, "ওরে বাপু, ওরা ওসব খেলনা দেখে ভয় পাওয়ার লোক

নয়। রাজা প্রতাপের বাড়িতে চুরি-ডাকাতির চেষ্টা বড় কম হয়নি, কিন্তু আজ অবধি কেউ কুটোগাছটি সরাতে পারেনি।”

জগা গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, “অস্তরটাকে কি খেলনা বলছেন ঠাকুরমশাই?”

রসময় একটু সতর্ক গলায় বললেন, “তা কে জানে! ওসব কখনও নাড়াঘাঁটা করিনি বাপু, ম্লেচ্ছ জিনিস। তবে মনে হয় ও সব ছোটখাটো অস্তরকে ভয় খাওয়ার পাত্র নয় হরুয়া, আরও একটা কথা বাপু, এত জিনিস থাকতে রাজা প্রতাপের ওই পেল্লায় শূল দিয়েই বা তোমার বামাচরণবাবু কী করবেন?”

জগা মাথা নেড়ে বলে, “আমিও জানি না, তবে বলছিলেন, শূলখানা পাচার করতে পারলে একদিন পেট পুরে ভুনি খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা খাওয়াবেন, ভুনি খিচুড়ি কখনও খেয়েছেন ঠাকুরমশাই?”

“এক-আধবার।”

“ওফ, সে রাজরাজড়ার ভোজ, তার সঙ্গে হাতাদুয়েক গরম ঘি হলে আর কথাই নেই, তা সেসব কথাও হয়েছে বামাচরণবাবুর সঙ্গে। পাঁপড়ভাজা হবে, ইলিশের ডিমের বড়া থাকবে, শেষ পাতে চাটনি আর দই।”

“এত কথাও হয়েছে নাকি?”

“আজ্ঞে। কথাবার্তা একেবারে পাকা।”

“কিন্তু শুলখানা যে সরাবে সেটা কিন্তু চুরির শামিল। চুরি করা কি ভাল কাজ হে জগা? অস্তরটা বরং তুমি বামাচরণবাবুকে ফেরত দিয়ে এসে গে। বলল, একাজ আমার দ্বারা হবে না।”

"তা হলে বাঘ মারব কী দিয়ে ঠাকুরমশাই? অস্তরটাকে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না তো ঠাকুরমশাই? তবে এই যে দেখুন-"

বলে পিস্তলটা তুলে জগা ঘোড়াটা টিপে দিল।

যে কাণ্ডটা হল, রসময় তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, বিকট একটা শব্দ আর সেইসঙ্গে আগুনের ঝলক তুলে একটা গুড়লের মতো জিনিস ছিটকে গেল, গাছ থেকে একটা কাক মরে পড়ে গেল বোধ হয় নীচে, পাখিরা তুমুল চিৎকার করতে লাগল। ভুলু লেজ গুটিয়ে কেঁউ-কেঁউ করতে লাগল, রসময় স্তম্ভনভাবটা কাটিয়ে নিয়েই লাফ মেরে পড়ে দৌড়তে লাগলেন। পেছনে পেছনে জগাও।

জগার হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়েছিল ঘাসের ওপর। কাকটা মরে পড়ে আছে একটা জামগাছের তলায়। রসময়ের লণ্ঠনের ম্লান আলোয় জায়গাটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

মন্দিরের পেছনের অন্ধকার বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে একটি ছায়ামূর্তি সর্পিল গতিতে বেরিয়ে এল। তার গায়ে কালো পোশাক। মুখটাও ঢাকা। একটা জোরালো টর্চের আলো ফেলে সে কিছু একটা খুঁজল। তারপর পিস্তলটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিল। এবার টর্চের আলো গিয়ে পড়ল মরা কাকটার ওপর। ছায়ামূর্তি একটু ইতস্তত করে মরা কাকটার ঠ্যাং ধরে হাতে ঝুলিয়ে দোলাতে-দোলাতে সামনের দিকের বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আধঘণ্টা বাদে লোকলস্কর, টর্চ, লণ্ঠন আর লাঠি সমেত রসময় আর জগা ফের ফিরে এল মন্দিরের চাতালে। সকলেই ভীষণ উত্তেজিত।

রসময় বলে উঠলেন, "ওই যে ওই জায়গায় পিস্তলটা পড়ে ছিল, আর ওইখানে কাকটা।"

কিন্তু টর্চের আলোয় কেউ কোথাও কিছু খুঁজে পেল না।

রসিক পাণ্ডা মস্তান গোছের লোক। চারদিক দেখেটেখে বলল, "রসময়, আজকাল গাঁজাটাজা খাচ্ছ না তো?"

রসময় উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এই তো জগা সাক্ষী আছে। ঝোলা থেকে পিস্তল বের করল, পিস্তল ফুটল, গুড়ুল ছুটে গেল, কাক মরল–এ যে একেবারে নিয্যস সত্যি ঘটনা।"

জগা জড়সড় হয়ে বলল, "আজ্ঞে তাই। অস্তরটা যে ওরকম সাজ্ঘাতিক, তা তো জানতুম না।"

রসিক বলল, "এ যে দেখছি চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। তবু চলো, আরও ভাল করে খুঁজে দেখা যাক। মন্দিরের ভেতর বার কোথাও বাদ রেখো না হে তোমরা।"

কিন্তু বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পাওয়া গেল না। বিষ্ণু নামে একটা ছেলে গাছতলায় টর্চের আলো ফেলে কী দেখছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, "রসিকদা, ঘটনাটা মিথ্যে নাও

২৪

হতে পারে। এখানে ঘাসের ওপর একটু রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে কিন্তু। আর কয়েকটা কাকের পালক।"

সবাই গিয়ে জায়গাটায় জড়ো হল। কয়েকটা টর্চের আলোয় বাস্তবিকই ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা কাকের পালক আর ঘাসের ওপর রক্তের ছিট-ছিট দাগ দেখা গেল।

রসিক পাণ্ডা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "রসময়, একবার যে থানায় যেতে হচ্ছে!"

"কেন ভাই?" "ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তবে থানায় একটা এত্তেলা দিয়ে রাখা দরকার। আর বামাচরণকেও খুঁজে বের করতে হবে। কেমন লোক সে? যার-তার হাতে পিস্তল তুলে দেয়–এ তো মোটেই ভাল কথা নয়! এরপর তো হাটে বাজারে অ্যাটম বোমা বিলি হবে।"

৩. দারোগা মদন হাজরা

দারোগা মদন হাজরা খুবই করিৎকর্মা লোক। পরদিন সকালে তিনি দলবল নিয়ে অ্যাকশনে নেমে পড়লেন। বেলা বারোটার মধ্যে পাঁচ-ছ'টা গ্রাম থেকে মোট এগারোজন বামাচরণকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হল। তাদের মধ্যে পনেরো। থেকে পঁচাশি সব বয়সের লোকই আছে। কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কেউ কালো, কেউ ধলো, কারও লম্বা সাদা দাড়ি, কারও পাকানো কালো কুচকুচে মোচ। একটা লম্বা দড়ি দিয়ে এগারোজনকেই কোমরে বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হল।

দৃশ্যটা দেখে মদন হাজরা খুবই খুশিয়াল হাসি হাসলেন। তিনি রোগাভোগা মানুষ, বারোমাস আমাশায় ভোগেন। লোকে তাঁকে আড়ালে চিমসে দারোগা বলে উল্লেখ করে, তিনি জানেন। তিনি যে একজন ডাকসাইটে মানুষ, এ-বিশ্বাস কারও নেই। তাই সুযোগ পেলেই তিনি নিজের কৃতিত্ব দেখানোর চেষ্টা করেন। আজ এগারোজন বামাচরণকে গ্রেফতার করার পর তিনি খুবই আহ্লাদ বোধ করছিলেন। ঝোলা গোঁফের ফাঁকে ফিচিক-ফিচিক হাসতে-হাসতে তিনি জগাকে ডেকে বললেন, "এই যে জগা, তল্লাট ঝেটিয়ে সবকটা বামাচরণকে ধরে এনেছি। এবার বাছাধন, তোমার বামাচরণটিকে দেখিয়ে দাও তো? বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তবে বলবে, বুঝলে তো!"

জগারও আজ আত্মাদ্রে সীমা নেই। থানার সামনে মেলা লোক জড়ো হয়েছে। সেপাইরা ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। বামাচরণরা সবাই এবং জড়ো হওয়া মানুষেরা তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। নিজেকে ভারী কেষ্টবিষ্টু মনে হচ্ছিল জগার।

সে উঠে প্রথম লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, লোকটা ছ' ফুট লম্বা, তেমনই চওড়া, বিরাট পাকানো গোঁফ, চোখদুটো বাঘের মতো গুলুগুলু।

জগা একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, ইনিই সেই বামাচরণ। একেবারে হুবহু তিনিই"।

লোকটা চোখ পাকিয়ে বাজখাঁই গলায় বলল, "অ্যা।"

জগা দুহাত পেছিয়ে গিয়ে বলল, "আজ্ঞে না। আপনি না। বামাচরণবাবুর বোধ হয় গোঁফ ছিল না।"

দ্বিতীয়জন বেঁটেখাটো, মাথায় টাক, দাড়িগোঁফ কামানো।

জগা তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলে উঠল, "আরে! এই তো বামাচরণবাবু! এই তো সেই-"

লোকটা দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "ইয়ার্কি হচ্ছে! ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পাওনি, হনুমান কোথাকার!"

জগা চোখ মিটমিট করতে করতে বলল, "আজ্ঞে ইনি হবেন কী করে? বামাচরণবাবুর যে বাঁ গালে আঁচিল ছিল।"

তৃতীয়জন পাকা দাড়িওলা বুড়ো মানুষ। চশমার ফাঁক দিয়ে জগাকে দেখছিলেন। হাতে লাঠি।

জগা গদগদ হয়ে বলল, "পেন্নাম হই বামাচরণবাবু, কতদিন পরে দেখা! সেই যে হাটে বাঘ মারার অন্তরটা দিলেন, তারপর আর দেখাই নেই! ভাল আছেন তো! বাড়ির খোকাখুকিরা সব ভাল?"

একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বুড়ো বামাচরণ বললেন, "হাতের লাঠিটা দেখছ তো! এমন দেব কয়েক ঘা-"

জগা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, "আরে না, আপনার কথা হচ্ছে না, আপনার কথা হচ্ছে না। সেই বামাচরণের তো দাড়িই ছিল না মোটে।"

চতুর্থজন বয়সে ছোঁকরা, ভাল করে দাড়িগোঁফ ওঠেনি। জগা মিটমিট করে তার দিকে চেয়ে থেকে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, “বামা না! উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক জিনিসই দিয়েছিলি বাপ! কী শব্দ, কী তেজ অন্তরটার!”

ছোঁকরা ফ্যাচ করে হেসে বলল, “জগাপাগলা, এক মাঘে শীত যায় না, বুঝলে! আমার জগদ্ধাত্রী ক্লাবের ছেলেরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢিল মেরে তোমার মাথার চাঁদি উড়িয়ে দেবে আজ”

জগা গম্ভীর হয়ে বলল, “আমি কি তোকে কিছু বলেছি রে বামা? বল তো, বলেছি? ওরে, আমার সেই বামাচরণের যে পেল্লায় দাড়িগোঁফ ছিল, তুই তো দুধের শিশু।”

পঞ্চমজন বেশ লম্বা একহারা চেহারার মানুষ। মুখোনা ভারী বিনয়ী। জগা তার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, “জিলিপি খাবে বলে জষ্টিমাসে যে আড়াইটে টাকা ধার নিয়েছিলে সেটা এবার ছাড়ো তো বাপু। নইলে দারোগাবাবুকেই কথাটা বলতে হয়।”

জগা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, “এ নয়। এ একেবারেই বামাচরণ নয়। কিছুতেই নয়। এ হতেই পারে না!”

ষষ্ঠজন এক আখাম্বা তান্ত্রিক। কাঁচাপাকা দাড়ি, রক্তাম্বর, কপালে প্রকাণ্ড তেল-সিঁদুরের তিলক, চোখ দুখানা লাল, চেহারাখানাও পেল্লায়।

জগা হাসি-হাসি মুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, “বামাবাবু যে! ক’দিনেই চেহারাখানা শুকিয়ে একেবারে আদ্দেক হয়ে গেছে দেখছি? তা বামাবাবাজি–”

তান্ত্রিক বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল, “জয় শিবশম্ভো! জয় মা তারা! তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে রে জগা, এই দিলুম তোকে অভিশাপ–”

তান্ত্রিক অভিশাপ দেওয়ার জন্য হাত তুলতেই জগা চট করে বসে পড়ল। তারপর একলাফে সরে চারদিকে চেয়ে অভিশাপটা কোথায় পড়ল তা খুঁজে দেখতে-দেখতে বলল, "তা বাজটা কোথায় পড়ল বাবাজি?"

"পড়েনি। পড়বে। তোর নিস্তার নেই রে জগা–"

জগা খুব অভিমানের গলায় বলল, "দিয়েই ফেললেন নাকি শাপটা?"

"এখনও দিইনি। এই দিচ্ছি–"

"থাক, থাক। আপনি মোটেই সেই বামাচরণ নন। সেই বামা পিস্তল নিয়ে ঘোরে, বাজ নিয়ে নয়।"

সপ্তমজন রোগাপাতলা চালাক-চালাক চেহারার একজন লোক। বাহারি সরু গোঁফ, বাবরি চুল, ঠোঁটে পানের দাগ।

বামাচরণ তার কাছাকাছি যেতেই লোকটা খুব মিহি গলায় বলল, "পরশু হাটুগঞ্জে আমাদের ফুল্লরা অপেরার কৃষ্ণার্জুন পালা হচ্ছে। গিয়ে আমার নাম বোলো গেটম্যানকে, বামাচরণ বিশ্বাস, একেবারে সামনের সারিতে বসিয়ে দেবে।"

জগা একগাল হেসে বলে, "কস্মিনকালে দেখিনি মশাই আপনাকে।"

অষ্টমজন মাঝবয়সী একজন নিরীহ লোক। এতক্ষণ ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদছিল। জগা তার সামনে যেতেই ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল, "এত হেনস্থাও কপালে লেখা ছিল ভাই জগা? সারা জীবন গরিব-দুঃখীর জন্য এত করলুম, শেষে আমাকে কিনা পুলিশে ধরল?"

জগা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আহা-আহা, কাঁদো কেন বাপু? গরিব-দুঃখীর জন্য খুব করো বুঝি তুমি?"

লোকটা চোখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নেড়ে বলে, "করতে আর পারলুম কই? যতবার গরিব-দুঃখীর জন্য কিছু করতে যাই ততবার আমার মাসি আমাকে বলে, "ওরে বামাচরণ, তোর মতো গরিব, তোর মতো দুঃখী আর কে আছে? তাই আর কিছু করে উঠতে পারলাম না রে ভাই!"

লোকটা জগার কাঁধে মুখ গোঁজার চেষ্টা করায় জগা একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, "আহা, আর কাঁদে না। তোমাকে না হয় ছেড়েই দিচ্ছি।"

"ছাড়বে কেন ভাই। বরং ফাটকেই দাও। তাও তো এরা দু'বেলা দুটি খেতে দেবে!"

নবমজন ঢুলুঢুলু চোখের একজন কেশ বাবু চেহারার যুবক। মুখে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। গুগুন করে একটা সুর ভাঁজছিল।

জগা তার সামনে দাঁড়াতেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, "বলো তো কী রাগ?"

জগা তটস্থ হয়ে বলে, "রাগারাগির কী আছে? আমি কি বাপু, রাগের কথা কিছু বলেছি?"

লোকটা মৃদু হেসে বলল, "পারলে না তো? এ হল বেহাগ। আচ্ছা এবার শোনো"

লোকটা ফের গুগুন করে সুর ভাঁজতে লাগল। ভারী আনমনা।

দশ নম্বর লোকটা খুবই বেঁটে। জগার কোমরসমান হবে।

জগা একটু ঝুঁকে দেখে বলল, "বামাবাবুই মনে হচ্ছে যেন!"

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "তা তো বটেই। অধমের নাম বামাচরণ সরখেল। আমার মামাশ্বশুর কে জানো? ডাকসাইটে

উঁকিল হিদারাম রায়। জজেরা তাকে দু'বেলা সেলাম ঠোকে। আমার পিসতুতো শালা হল গয়েশপুরের দারোগা দাশরথি দাস। আমার খুড়শ্বশুর কে জানো? কালিয়াগঞ্জের–"

জগা একটু রেগে গিয়েই বলল, “থাক, থাক, মশাই, আপনার আর বামাচরণ হয়ে কাজ নেই।”

এগারো নম্বর এক বুড়োঘূখুড়ে মানুষ। তাকে দেখেই বিকট গলায় বলতে লাগল, “ক্যা ক্যা ক্যা রে তুই? অলপ্পেয়ে! পাজি! ছুঁচো! কেন ধরে এনেছিস র‍্যা আমায়? আমার চান-খাওয়ার সময় হয়নি নাকি র‍্যা? অ্যা, এখন বাজে ক’টা খেয়াল আছে?”

জগা তাড়াতাড়ি পরের লোকটার সামনে গিয়ে একটা নিশ্চিন্তের খাস ছেড়ে বলল, “এই যে! পেয়ে গেছি দারোগাবাবু। এই হল সেই বামাচরণ। একেই ভাল করে ধরুন।”

লোকটা চোখ পাকিয়ে বলল, “ইয়ার্কির আর জায়গা পেলে না? আমি আবার বামাচরণ হলাম কবে? আমি এই থানার সেপাই গুলবাগ সিং।”

জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে জগা বলল, “সেপাইজি! ছিঃ ছিঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।”

কাণ্ড দেখে বাইরের জমায়েত লোকজন হোঃ হোঃ করে হাসতে লেগেছে। আর এগারোজন বামাচরণ সমস্বরে চেঁচাচ্ছে, “আমরা দেখে নেব। এইভাবে কোমরে দড়ি বেঁধে হাজারটা লোকের সামনে এই যে আমাদের হেনস্থা হচ্ছে এর প্রতিশোধ আমরা নেবই। মদন দারোগার নামে মামলা করব আমরা। জেল খাঁটিয়ে ছাড়ব”...ইত্যাদি।

মদন হাজরার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, গোঁফ ঝুলে পড়েছে, চেঁচামেচি শুনে দু’হাতে কান চাপা দিয়ে মদন হেঁকে বললেন, “সসম্মানে খালাস! সসম্মানে খালাস! ওরে কে আছিস, বামাচরণদের কোমরের দড়ি খুলে দে...”

এক নম্বর বামাচরণ এগিয়ে এসে মদনের টেবিলে এক পেল্লায় চাপড় মেরে বলল, “শুধু ছেড়ে দিলেই হবে? আমার যে অপমান হল তার জন্য এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাই।”

অন্য বামাচরণরাও এককাট্টা হয়ে চেঁচাতে লাগল, “আমি দেড় লাখ চাই। আমার সারাদিনের ব্যবসা নষ্ট, পাঁচ লাখের নীচে নামতে পারব না। ...আমার দশ লাখ..”

মদন হাজরা লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলেন, "দরওয়াজা, শিগগির বামাচরণদের সসম্মানে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে থানা থেকে বের করে দে।"

চেঁচামেচি হইহট্টগোলে চারদিকে তুলকালাম হতে লাগল। যে-সেপাইটা বামাচরণদের ঘাড়ধাক্কা দিতে গিয়েছিল তাকে এগারোজন বামাচরণ পেড়ে ফেলল। মদন হাজরা হা-ক্লান্ত হয়ে বসে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, "যত নষ্টের গোড়া হল ওই জগাপাগলা। ওরে গুলবাগ সিং, ওটাকে ধরে হাজতে পুরে দে তো! তারপর ব্যাটাকে এমন ধোলাই দিতে হবে যে–"

ঠিক এই সময়ে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সরু হয়ে রসময় চক্রবর্তী এসে সামনে দাঁড়ালেন, হাতজোড় করে বললেন, "বড়বাবু। কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে।"

"ভূল! কিসের ভুল?"

"বলছিলুম যে, বামাচরণ কাঁচা লোক নয়। সে নিজের আসল নামটাই জগাকে বলেছে বলে মনে হয় না।"

"আসল নামটা তা হলে কী?"

"সেটা জানলে আর এত জল ঘোলা হবে কেন? জগাকে সে শুধু পিস্তলটাই দেয়নি, প্রতাপরাজার শুলটাও চুরি করার দায়িত্ব দিয়েছে, সেটা ভুললে চলবে না।"

গম্ভীর হয়ে মদন হাজরা বললেন, "। কিন্তু শুলটা দিয়ে কী করবে?"

"সেটাই ভাবনার বিষয়। শুলখানা আমি দেখেছি। সোনাদানা দিয়ে তৈরি হলেও না হয় কথা ছিল। তা নয়, শুলখানা নিতান্ত লোহা দিয়েই তৈরি। তার ওপর ওজনদার জিনিস, প্রায় দেড় মন। বামাচরণ এই শুল দিয়ে কী করবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। দুধসায়রের

দ্বীপে তার কোনও আস্তানা আছে কি না সেটাও দেখা দরকার। আমি বলি কি হুজুর, হুটপাট না করে আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টা ভাবা উচিত।”

দারোগা চিন্তিত হয়ে বললেন, “হুঁ।”

৪. ক্ষান্তমণি সকালে বাগানে গিয়েছিল

ক্ষান্তমণি সকালে বাগানে গিয়েছিল শাক তুলতে। তখনই দেখে বাগানে একটা কালো আনারস পড়ে আছে। দেখে তার ভারী আহ্লাদ হল। কাঁচা আনারসের অম্বল খেতে বড় ভাল।

কিন্তু সেটা কাটতে গিয়ে দেখল, বঁটিতে মোটেই কাটা যাচ্ছে। রেগে গিয়ে বলল, "মরণ! এ আনারস কাটতে কি এবার রামদাখানা নামাতে হবে নাকি? বলি ও খাসনবিশ, কোথায় গেলি? আয় বাবা, আনারসখানা একটু ফালি দিয়ে যা। বুড়ো হয়েছি তো, হাতেরও তেমন জোর নেই।"

খাসনবিশ বারান্দার কোণে তার ঘরে বসে নিবিষ্টমনে তামাক সাজছিল। বলল, "ক্ষ্যান্তদিদি যে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলে! বলি আনারস আবার এল কোথা থেকে? চোখের মাথা তো খেয়েই বসে আছ, এখন মাথাটাও গেছে দেখছি।"

"আমার মাথা গেছে, না তোর মাথা! আনারস নয় তো কি এটা কাঁটাল? আমাকে এলেন উনি আনারস চেনাতে। ওরে, আনারস খেয়ে-খেয়ে আমার এক জন্ম কাটল। তুই তো সেদিনের ছেলে।"

"হ্যাঁ গো ক্ষ্যান্তদিদি, তুমি যে আনারসে এম.এ পাশ তা জানি। কিন্তু বলি এই অকালে আনারস পেলে কোথায়? বাজার থেকে তো আমি আনারস আনিনি, বাগানেও আনারস ফলেনি, তবে কি ভূতে দিয়ে গেল?"

"তা যদি ভূতের কথাই বলিস বাছা, তো বলি, এ ভূতের দেওয়া বলেই না হয় মনে করলি? বলি, চোখের মাথা কি আমি খেয়ে বসেছি, না তুই? বাগানে তো দু বেলা মাটি কোপাস, এমন আনারসটা তোর চোখে পড়ল না? না কি আজকাল তামাকের বদলে গাঁজা খাচ্ছিস!"

খাসনবিশ হুঁকো হাতে বেরিয়ে এসে বলল, "গাঁজা যে কে খায় তা বোঝাই যাচ্ছে। তা আনারসটা কোথায়?"

ক্ষান্তমণি আনারসটা হাতে দিয়ে বলে, "বড্ড কচি তো, তাই শক্ত। বঁটিতে ধরছে না। বঁটিটার ধারও বোধ হয় গেছে। শানওলা এলে ডাকিস তো, বঁটিটা শানিয়ে নিতে হবে।"

আচমকা খাসনবিশের হাত থেকে হুঁকোটা পড়ে গেল। সে আঁ-আঁ করে শব্দ করতে করতে বসে পড়ল হঠাৎ।

ক্ষান্তমণি বলল, "আ মোলো যা! এ যে হঠাৎ ভিরমি খেতে লেগেছে। বলি, ও খাসনবিশ, তোর হল কী?"

খাসনবিশ হঠাৎ বিকট স্বরে "পালাও! পালাও!" বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে উঠে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল।

ক্ষান্তমণি হাঁ করে দৃশ্যটা দেখে বলল, "গেল যা? এই দিনে দুপুরে ভূত দেখল নাকি রে বাবা! রাতবিরেতে দেখে, সে না হয় আমিও দেখি, কিন্তু দিনে-দুপুরে তো বাপু কখনও কেউ দেখেছে বলে শুনিনি।"

গগনবাবু একসময়ে মিলিটারিতে ছিলেন। রিটায়ার করে গাঁয়ে ফিরে এসে চাষবাসে মন দিয়েছিলেন।

গাঁয়ে এসে গগনবাবু লক্ষ করলেন, গাঁয়ে বীরের খুব অভাব। বেশিরভাগ ছেলেই রোগাপটকা, ভিতু, দুর্বল। তিনি ছেলেপুলেদের জড়ো করে রীতিমতো মিলিটারি কায়দায় লেক্ট রাইট, দৌড় এবং ব্যায়াম শেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেগুলোর ডিসিপ্লিনের বড় অভাব। একদিন এল তো তিনদিন এল না। তার ওপর মিলিটারি কায়দায় শক্ত ট্রেনিং তারা বেশি সহ্যও করতে পারছিল না। সুতরাং গগনবাবুর আখড়া থেকে ছেলেরা একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে পালাতে লাগল।

পাশেই মাইলগঞ্জে কিছুদিন কাইজার নামে একটা লোক এসে কুংফু আর ক্যারাটে শেখাতে শুরু করে। গাঁয়ের মেলা ছেলেপুলে গিয়ে কাইজারের আখড়ায় ভর্তি হয়ে মহানন্দে মার্শাল আর্ট শিখতে লেগেছে। গগনবাবু কুংফু, ক্যারাটে দুচোখে দেখতে পারেন না। তাঁর ধারণা, ওসব শিখলে বীরের বদলে গুণ্ডা তৈরি হবে। কাইজারের ওপরেও তাই তাঁর খুব রাগ।

গগনবাবু সকালে বারান্দায় তাঁর ইজিচেয়ারে বসে আছেন। পুজোর ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য তাঁর ছেলে গোবিন্দ আর নাতি পুটু আসায় তাঁর সময়টা ভালই কাটছে। পুটু সিঁড়িতে বসে বারান্দার ওপর একটা রিমোট কন্ট্রোল খেলনা-মোটরগাড়ি চালাচ্ছিল।

হঠাৎ পুটু বলল, "আচ্ছা দাদু, তুমি কখনও বাতাসা-দ্বীপে

গেছ?"

"যাইনি। অনেকবার গেছি।"

"সেখানে কী আছে?"

"কী আর থাকবে! একটা ভাঙা বাড়ি আর গাছপালা।"

"আচ্ছা, বাতাসা-দ্বীপে কি ভূত আছে?"

"ভূত! ভূত আবার কী?"

"খাসনবিশদাদা বলছিল সেখানে নাকি একটা খুব লম্বা ভূত আছে। দশবারো ফুট লম্বা।"

"খাসনবিশ নিজেই একটা ভূত। একসময়ে খাসনবিশও মিলিটারিতে চাকরি করত। তাতেও ওর ভয়ডর কিছু কাটেনি। আমাদের ক্ষ্যান্তদিদি আর খাসনবিশ প্রায়ই নাকি ভূত দেখে। ওদের কথা বাদ দাও।"

“কুনকে আর ভোলা বেজি ধরতে গিয়ে নাকি দেখেছে।”

“গাঁয়ের ছেলেরা কত কী দেখে! ওসব বিশ্বাস না করাই ভাল। এদের শুধু ভয় আর ভয়। সত্যিকারের সাহসী ছেলে একটাও দেখতে পাই না।”

“আচ্ছা দাদু, জগাপাগলা নাকি সত্যিকারের পিস্তল দিয়ে একটা কাক মেরেছে।”

“ওটাও আষাঢ়ে গল্প। পিস্তল ও পাবে কোথায়? পিস্তল কি ছেলের হাতের মোয়া?”

“কিন্তু সবাই যে বলছে!”

“গাঁয়ে গুজবের অভাব কী? এখানে কেউ ভূত দেখে, কেউ পরি নামায়, কেউ মন্ত্রতন্ত্রের জোরে আকাশে ওড়ে কত কী শুনবে।”

ঠিক এই সময়ে ভেতরবাড়ি থেকে বাগানের ভেতর দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে খাসনবিশ ছুটে এসে চিৎকার করতে লাগল,

“বোমা! বোমা! কতা, শিগগির পালান...”

গগনবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, “কিসের বোমা? কোথায় বোমা?”

“বাড়ির ভেতরে। ক্ষ্যান্তদিদি সেটা বঁটি দিয়ে কাটবার চেষ্টা করছে।”

কথাটা গগনবাবুর তেমন বিশ্বাস হল না। বললেন, “কীরকম বোমা?”

“আজ্ঞে গ্রেনেড। একেবারে মিলিটারি গ্রেনেড।”

গগনবাবু টপ করে উঠে দাঁড়ালেন। পুটুকে বললেন, “তুমি এখানেই থাকো। আমি আসছি।”

ভেতরবাড়িতে এসে গগনবাবু যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। ক্ষ্যান্তমণি বারান্দার শানের ওপর একখানা হাত-দা দিয়ে বোমাটা কাটার জন্য উদ্যত হয়েছে।

গগনবাবু একটা পেল্লায় ধমক মারলেন, "অ্যাই ক্ষান্ত! উঠে আয় বলছি!"

ক্ষান্তমণি গর্জন শুনে অবাক হয়ে বলল, "কী হল বলো তো তোমাদের! সকালবেলায় এত চেঁচামেচি কিসের?"

গগনবাবু দ্রুতপায়ে গিয়ে ক্ষান্তমণিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বোমাটা তুলে নিলেন। মিলিটারিদের হ্যান্ডগ্রেনেড। ভাগ্য ভাল, ফিউজটা অক্ষত আছে। ফাটলে এতক্ষণে ক্ষান্তমণি সহ বাড়ির খানিকটা অংশ উড়ে যেত।

ক্ষান্তমণি পড়ে গিয়ে চিলচ্যাঁচানি চেঁচাচ্ছিল, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে! মাজাটা যে ভেঙে সাত টুকরো হয়ে গেল বাপ! কোথায় যাব রে! কর্তাবাবুর যে মাথাখারাপ হয়ে গেছে। গিন্নিমা, শিগগির এসো!"

চেঁচামেচিতে গগনবাবুর স্ত্রী, পুত্রবধু এবং বাড়ির অন্য সবাই ছুটে এল। "কী হয়েছে! কী হয়েছে।" বলে মহা শোরগোল।

গগনবাবু ভ্রূ কুঁচকে গ্রেনেডটা দেখছিলেন। বললেন, "এটা তুই কোথায় পেলি?"

ক্ষান্তমণি কোঁকাতে-কোঁকাতে বলল, "কোথায় আর পাব! বাগানে শাক তুলতে গিয়ে দেখি কালো আনারসটা খেতের মধ্যে পড়ে আছে। তা তাতে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে শুনি, যে, এরকম রামধাক্কা দিয়ে আমার মাজাটা ভাঙলে! বুড়ো বয়সের ভাঙা হাড় কি আর জোড়া লাগবে?"

গগনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "তবু তো মাজার ওপর দিয়ে গেছে। আর একটু হলে তো উড়ে যেতি।"

হাঁফাতে-হাঁফাতে খাসনবিশ ফিরে এসে একবালতি জল তুলে আনল চৌবাচ্চা থেকে। গগনবাবু বোমাটা জলের মধ্যে রেখে বললেন, "মদন হাজরাকে ডেকে আন। যদিও সে খুব করিৎকর্মা লোক নয়, তবু জানানোটা আমাদের কর্তব্য।"

আধঘণ্টা বাদে মদন হাজরা সেপাইশাস্ত্রী নিয়ে কাহিল মুখে এসে হাজির হলেন। বললেন, "বিদ্যাধরপুরে এসব কী হচ্ছে মশাই? কাল এক পিস্তলের জের সামলাতে জেরবার হতে হয়েছে, এর ওপর আপনার বাড়িতে বোমা! লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দিয়েছি মশাই, তিন মাস গিয়ে নয়নপুরে মাসির বাড়িতে থেকে আসব।"

জলে ভেজানো বোমাটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে মদন হাজরা বললেন, "এ তো ডেঞ্জারাস জিনিস দেখছি।"

গগনবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মিলিটারিতে ব্যবহার হয়। হাইলি সেনসিটিভ।"

"তা এটা নিয়ে করব কী বলুন তো!"

"নিয়মমতো থানায় নিয়ে রাখতে হবে। তদন্ত করতে হবে।"

"ও বাবা! যদি ফেটেফুটে যায়?"

"ফিউজটা নাড়াচাড়া না করলে ফাটবার কথা নয়। বালতিসুদ্ধুই নিয়ে যান।"

মদন হাজরা চোখ বুজে ঠাকুর-দেবতাকে খানিকক্ষণ স্মরণ করে বললেন, "ওরে গুলবাগ সিং, নে বাবা, জয় সীতারাম বলে বালতিটা নিয়ে পেছনে-পেছনে আয়, একটু দূরে-দুরেই থাকিস বাপ। সবাই মিলে একসঙ্গে মরে তো লাভ নেই রে!"

গুলবাগ সিং যথেষ্ট সাহসী লোক। ডাকাবুকো বলে থানায় তার বেশ সুনাম আছে। গুলবাগ একটা তাচ্ছিল্যের "হুঁঃ" দিয়ে বালতিটা হাতে নিয়ে বলল, "চলুন।"

মদন হাজরা এবং অন্য সেপাইরা আগে-আগে, পেছনে গুলবাগ। কিন্তু পথে নেমেই গুলবাগ দেখল, মদন হাজরা আর সেপাইরা বড্ড জোরে হাঁটছে, হাঁটার চেয়ে দৌড়ই বলা ভাল। জলভরা বালতি নিয়ে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া হুড়োহুড়ি করলে নড়াচড়ায় বোমাটা ফেটে যেতে পারে। তাই গুলবাগ ঠোঁট-মুখ কুঁচকে আস্তে-আস্তেই হাঁটতে লাগল। ইতিমধ্যে মদন হাজরা আর সেপাইরা এ ওকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করতে করতে প্রাণপণে দৌড়ে হাওয়া হয়ে গেল।

কানা কালীর মাঠের কাছে পথটা ভারী নির্জন। চারদিকে বন, ঝোঁপঝাড়। সেইখানে গাছতলায় সবুজ রঙের চেককাটা লুঙ্গি আর হাফহাতা গেঞ্জি গায়ে, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা একটা লোক দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে ছিল। গুলবাগকে দেখে বলল, "সেপাইজি, সেলাম। তা ফাঁড়িতে কি জলের অভাব হয়েছে নাকি? টিউকলটা কি খারাপ?"

গুলবাগ রক্তচক্ষুতে একবার লোকটার দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, "আরে আমরা থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন সেপাইজি? দিন, বয়ে দিয়ে আসি। আমরা পাঁচজন থাকতে এসব ছোট কাজ আপনারা করবেন কেন? ছিঃ ছিঃ, এ যে বড় লজ্জার কথা!"

প্রস্তাবটা গুলবাগের খুব খারাপ লাগল না। মালটা বইতে হবে, তার ওপর বোমা ফাটলে এই ব্যাটার ওপর দিয়েই যাবে। তাই গুলবাগ বালতিটা লোকটার হাতে ছেড়ে দিল।

গুলবাগ আগে, লোকটা পেছনে। গুলবাগ মাঝে-মাঝে পেছনে তাকিয়ে লোকটাকে নজরে রাখছিল।

হঠাৎ লোকটা বলে উঠল, "সেপাইজি, বালতির মধ্যে ভুড়ভুড়ি কাটছে কী বলুন তো! ও বাবা! এ যে ঘুটঘুট করে কেমন একটা শব্দও হচ্ছে।"

"বাপ রে!" বলে গুলবাগ চোঁ-চোঁ দৌড় মারল।

খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা লোকটা একটু হেসে বালতি নিয়ে রাস্তার পাশে ঝোঁপের আড়ালে নেমে গেল। বোমাটা বের করে বালতির জলটা ফেলে দিয়ে বালতিটা একটা ঘন ঝোঁপের মধ্যে গুঁজে দিল। তারপর বোমাটা একটা ঝোলায় পুরে শিস দিতে দিতে জঙ্গলের ভেতরপথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুপুরের মধ্যেই সবুজ চেক লুঙ্গি পরা, হাতাওলা গেঞ্জি গায়ে আর খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা মোট সাতজনকে থানায় ধরে আনা হল।

গুলবাগ সিং প্রত্যেকটার মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে রক্তচক্ষুতে চেয়ে দেখল। এমনকী দিনের আলোতেও টর্চ ফোকাস করে খুঁটিয়ে নিরখ-পরখ করে তারও প্রত্যেককেই সেই লোকটা বলে মনে হতে লাগল। হাল ছেড়ে দিয়ে সে বলল, "বড়বাবু, এদের সবকটাই বদমাশ বলে মনে হচ্ছে। সবকটাকেই বরং হাজতে পুরে রাখি।"

একথা শুনে সাতটা লোকই মহা শোরগোল তুলে ফেলল। তার গতকাল এগারোজন বামাচরণের ঘটনা জানে। তারাও বলতে লাগল, "আমরা মানহানির মামলা আনব। ...সরকার বাহাদুরের কাছে বড়বাবুর নামে নালিশ জানাব... আমাদের এরকম নাহক হয়রানির জন্য মোটা টাকা না দিলে ছাড়ব না...ওরে ভাই, এতক্ষণে আমার দেড় মন মাছ পচে নষ্ট হয়ে গেল, কম করেও হাজার টাকা লোকসান.... আর আমার কী হবে, দোকান ফেলে এসেছি, এতক্ষণে সব লুটপাট হয়ে গেছে..."।

মদন হাজরা কানে হাতচাপা দিয়ে বললেন, "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, যেতে না চাইলে লাঠিচার্জ কর.."

ঠিক এই সময়ে ফের সরু হয়ে খুবই বিনীতভাবে রসময় চক্রবর্তী এসে মদন হাজরার সামনে দাঁড়ালেন।

মদন হাজরা বলে উঠলেন, "আবার আপনি? আপনার আবার কী দরকার?"

রসময় হাতজোড় করে বললেন, "বড়বাবু, বেয়াদপি মাপ করবেন। বলছি কী, এ-সময়টায় মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা খুব দরকার।"

"মাথা ঠাণ্ডা রাখব? এসব ঘটলে কি মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায়?"

রসময় বিনীত হাসি হেসে চাপা গলায় বললেন, "যা শত্রু পরে পরে। বুঝলেন কিনা!"

"না, বুঝলাম না।"

"বলছি কী, বোমাটা যদি লোকটা নিয়েই গিয়ে থাকে তাতে একরকম ভালই হয়েছে। থানায় রাখলে কখন ফেটেফুটে থানাই হয়তো উড়ে যেত। তার চেয়ে ও আপদ বিদেয় হওয়াতে একরকম স্বস্তি। ফাটে তো সেই ব্যাটার কাছেই ফাটবে।"

মদন হাজরার মুখটা একটু উজ্জ্বল হল। বললেন, "বসুন ঠাকুরমশাই। বসুন। কথাটা খারাপ বলেননি। বোমাটা থানায় রাখলে বড় দুশ্চিন্তার ব্যাপার হত। সদরে খবর দিলে বম্ব এক্সপার্ট কবে আসবে তার জন্য বসে থাকতে হত। হয়তো ওই সর্বনেশে বোমা নিয়ে আমাকেই সদরে যাওয়ার হুকুম হত। নাঃ, আপনি ঠিকই বলেছেন! আর কিছু বলবেন? আপনি বেশ উপকারী কথা বলতে পারেন দেখছি!"

রসময় বিগলিত হয়ে বললেন, "চেষ্টা করি আর কি।"

"মাথায় কোনও ভাল কথা এলেই আমার কাছে চলে আসবেন।"

"যে আজ্ঞে। আর একটা কথা!"

"কী বলুন তো?"

"প্রতাপরাজার শূলটার কথা ভুলে যাননি তো বড়বাবু?"

"ওঃ, সেই দেড় মন ওজনের লোহার শুল তো, যেটা বামাচরণ জগাপাগলাকে চুরি করতে বলেছিল? না, ভুলিনি, কিন্তু শুলটার রহস্য কী বলুন তো?"

মাথা নেড়ে রসময় বললেন, "আমিও জানি না আজ্ঞে।"

৫. সন্ধেবেলা শিবমন্দিরের চাতালে

সন্ধেবেলা শিবমন্দিরের চাতালে দুজন বসা। রসময় আর জগাপাগলা। সিঁড়ির নীচে কুকুর ভুল। চারদিকটা অন্ধকারে বড্ড ছমছম করছে।

রসময় বললেন, "ও জগা, শুনেছ তো, গগনবাবুর বাড়ির বাগানে একখানা বোমা পাওয়া গেছে।"

"বোমা! বলেন কী ঠাকুরমশাই?"

"হ্যাঁ গো, যে-সে বোমা নয়, মিলিটারি বোমা। সাঙ্ঘাতিক জিনিস। দেখতে অনেকটা আনারসের মতো।"

জগা একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, "আনারসের মতো দেখতে! সেটা বোমা হতে যাবে কোন দুঃখে? সেটা তো স্বপ্ন তৈরির কল!"

রসময় অবাক হয়ে বললেন, "স্বপ্ন তৈরির কল? সে আবার কী জিনিস?"

জগা একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে পরেশবাবু তৈরি করেছেন। খুব মজার জিনিস।"

রসময় অবাক হয়ে বলেন, "পরেশবাবুটা কে?"

"ভারী ভাল লোক। জিলিপি খাওয়ার জন্য পয়সা দিয়ে গেছেন।"

"তাব সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?"

জগা মাথা চুলকে বলল, "বড্ড মুশকিলে ফেললেন। বলা বারণ কি না। তবে আপনি বলেই বলছি। পাঁচ কান করবেন না।"

"পাঁচ কান করব কেন? বলে ফেল।"

"আজ্ঞে, আমি তো কুনকেঁদের কাছারিঘরের বারান্দায় শুই, তা সেখানেই দেখা।"

"ঘটনাটা খোলসা করে বলো।"

"পরশু রাতে শুয়ে আছি মুড়িসুড়ি দিয়ে। একটা ভারী ভাল স্বপ্নও দেখছিলুম। এক রাজবাড়িতে ভোজ হচ্ছে। আর আমার পাতে একজন লোক গরম-গরম জিলিপির পর জিলিপি দিয়ে যাচ্ছে। দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ওঃ সে একেবারে জিলিপির পাহাড় হয়ে গেল।"

"তারপর?"

"ওই সময়েই পরেশবাবু এসে ঠেলে তুললেন, "ও জগা, ওঠো ওঠো! তা উঠে ভারী রাগ হল। বললুম, মশাই, দিলেন তো জিলিপির স্বপ্নটার বারোটা বাজিয়ে! তিন-চারটে খেয়েছি কি

-খেয়েছি অমনই কাঁচা ঘুমটা ভাঙালেন! কত জিলিপি বাকি রয়ে গেল বলুন তো!' তখন পরেশবাবু খুব হাসলেন। বললেন, "স্বপ্ন দেখতে চাও, তার আর ভাবনা কী? তোমাকে এমন একটা কল দিচ্ছি যা থেকে কেবল রোজ জিলিপির স্বপ্নই বেরিয়ে আসবে। রোজ সারারাত ধরে কত খাবে খাও।"

"বটে।"

"তবে আর বলছি কী! কলটা শুধু মাথার কাছে রেখে শুলেই হবে।"

"তারপর?"

"তা পরেশবাবু একটা নয়, দু-দুটো কল আমার হাতে দিয়ে বললেন, "শোনো জগা, এই বাঁ হাতেরটা তোমার। এটাতে শুধু জিলিপির স্বপ্ন ভরা আছে।"

জগা একটু থামতেই রসময় বলে উঠলেন, "আর একটা?"

জগা মাথা চুলকে বলল, "আপনাকে বলেই বলছি। পাঁচ কান করবেন না। আর-একটা কলে ভূতের স্বপ্ন পোরা ছিল। পরেশবাবু বললেন, 'জানো তেতা, দু'পাতা সায়েন্স পড়ে নাস্তিকরা আর ভূতপ্রেত মানে না। ওই গগনবাবু আর তার ছেলে গোবিন্দ ভারী নাস্তিক। এই তো সেদিন বাতাসা দ্বীপের ঢ্যাঙা ভূতের কথা বলতে গিয়েছিলাম, তা এমন হাসিঠাট্টা করল যে, বলার নয়। তাই ওদের একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কলটা বানিয়েছি। চুপিচুপি গিয়ে গগনবাবুর ঘরে রেখে আসলেই হবে। রাখার আগে কলের গায়ে একটা জিনিস কামড়ে ছিঁড়ে দিতে হবে। দেখবে প্রতি রাতে বিটকেল সব ভূতের স্বপ্ন দেখে বাপ-ব্যাটা কেমন চেঁচামেচি লাগায়।"

"তারপর?"

"তা আজ্ঞে, গগনবাবুর ওপর আমারও একটু রাগ আছে। মেয়ের বিয়েতে ভোজ খেতে গিয়েছিলুম। তিনবার লাইন থেকে তুলে দিল, বলল, পরের ব্যাচে বসিস। তা শেষে বসলুম বটে, কিন্তু ঘ্যাঁটম্যাট ছাড়া কিছুই জুটল না। শেষ পাতে লালমোহনটা অবধি দিলেন না। কী অবিচার বলুন তো!"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"তাই আমি পরেশবাবুর কথামতো কলটা রেখে আসতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ওদের কুকুরটা এমন তাড়া করল যে, ভয়ে বাগানে ফেলে আসি।"

"অ। তা তোমার কলটা কই?"

"কেন, এই যে আমার ঝোলার মধ্যে!" বলতে বলতে জগা তার ঝোলায় হাত পুরে কালো আনারসটা বের করে এনে রসময়কে দেখিয়ে একগাল হেসে বলল, "রোজ শিয়রে নিয়ে

শুই। কাল রাতেও খুব জিবেগজা খাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি মশাই। মনে হয় পরেশবাবু ভুল করে একটা জিবেগজার কলই দিয়ে গেছেন। তা জিবেগজাই বা খারাপ কী বলুন!"

জিনিসটা দেখে রসময়ের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়! তবে তিনি মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে বললেন, "ঠিক আছে, ওটা ঝোলায় রেখে দাও সাবধানে। বেশি নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। ওতে জিবেগজার খুব ক্ষতি হয়।"

জগা সাবধানেই জিনিসটা পুরে রাখার পর রসময় বললেন, "এবার বলো তো, পরেশবাবুটা কে?"

জগা জুলজুল করে চেয়ে বলে, "আজ্ঞে পরেশবাবু খুব ভাল লোক। আমাকে জিলিপি খেতে পাঁচটা টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন, স্বপ্নের জিলিপি খাওয়া ভাল, আবার জেগে খাওয়াও ভাল।"

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু লোকটা থাকে কোথায়?" মাথা নেড়ে জগা বলে, "তা জানি না।"

"দেখতে কেমন?"

"আজ্ঞে, বেঁটেমতো। মাথায় টাক আছে।"

"ঠিক তো! পরে আবার গুলিয়ে ফেলো না। বামাচরণকে নিয়ে যা করলে সেটা তো যাচ্ছেতাই ব্যাপার।"

"আজ্ঞে না, এবার আর গণ্ডগোল পাবেন না। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। এই আপনার মতোই নাটা মানুষ!"

রসময় ভারী অবাক হয়ে বলে, "আমি আবার নাটা হলাম কবে থেকে? সবাই তো বলে আমি একজন লম্বা মানুষ।"

"অ্যাঁ, আপনি বেঁটে নন?"

"কস্মিনকালেও না।"

ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁস করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে জগা বলল, "তা হলে তো বড্ড মুশকিলে ফেললেন ঠাকুরমশাই। আমি যে আপনাকে বেঁটে বলেই জানতুম। আপনি বেঁটে, মহেশবাবু বেঁটে, ফটিকবাবু বেঁটে, খাসনবিশ বেঁটে।"

রসময় বললেন, "তুমি যে মুড়ি-মিছরির এক দর করে ফেললে হে! ফটিকবাবু বেঁটে হলেও মহেশবাবু বেশ লম্বা। আর খাসনবিশ মাঝারি।"

জগা জুলজুল করে চেয়ে বলল, "বড্ড ভাবনায় ফেললেন ঠাকুরমশাই। এখনও খিচুড়ির ব্যাপারটাই মেটেনি, মাথায় আবার নতুন একটা ভাবনা ঢুকল।"

"ভাল করে ভেবে বলো তো, পরেশবাবু বেঁটে, না লম্বা।"

জগা খুব লজ্জিত মুখে বলে, "লম্বাই হবেন বোধ হয়।"

"গোঁফ আছে?"

"থাকার কথা নাকি ঠাকুরমশাই? তা হলে আছে।"

"নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না দেখছি।"

"এইজন্যই তো আমি একটা চশমা চাইছি। চশমা চোখে দিলে বাহারও হয়, আর লম্বা না বেঁটে, কালো না ধলো তাও ঠাহর হয়। কিন্তু কেউ চশমা দিচ্ছে না মশাই। ফটিকবাবুকে বললুম, "আপনার মা তো গত হয়েছেন, তাঁর চশমাজোড়া আমাকে দিন।' তা তিনি খ্যাঁচ করে উঠলেন, "সোনার চশমা তোমাকে দিই আর কি! মহেশবাবুকেও বলেছিলুম, আপনার তো দুজোড়া চশমা, দিলেনই না হয় আমাকে একজোড়া।' তা ভ্যাল ভ্যাল করে চেয়ে থাকেন, কথা কানেই তোলেন না। এরকম হলে তো আমার চলে না মশাই। চশমা ছাড়া বড়ই অসুবিধে হচ্ছে।"

রসময় লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "চলো হে জগা, ঝোলাটা সাবধানে কাঁধে ঝুলিয়ে নাও। দেখো, পড়ে টড়ে না যায়। স্বপ্নের কলে চোট লাগা ভাল নয়।"

জগা ঝোলা নিয়ে উঠল। বলল, "চশমার কথাটা একটু খেয়াল রাখবেন ঠাকুরমশাই।"

"খুব রাখব। হ্যাঁ, ভাল কথা। আজও কি কুনকেঁদের বারান্দাতেই রাতে শোবে নাকি?"

ঘনঘন মাথা নেড়ে জগা বলল, "না মশাই, না। রোজ-রোজ এক বাড়িতে শুলে কি আমার চলে! আমার পাঁচজনকে দেখতে হয় যে। আজ ভাবছি ফটিকবাবুর বারান্দায় শোব।"

"বেশ, বেশ।" জগা খুশি হয়ে বলল, "ফটিকবাবুর বারান্দা বেশ জায়গা। উলটো দিকে ফলসা বনে নিশুত রাতে জ্যোৎস্না উঠলে পরিরা আসে। উড়ে-উড়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। তারা লোকও খুব ভাল।"

"তাই নাকি? ভাল, ভাল।"

বাঁশবনের ভেতরকার নির্জন কাঁচা রাস্তাটা পেরিয়ে জগা বাঁ দিকে ফটিকবাবুর বাড়ির মুখো রওনা হল। রসময় ডান দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন।

মদন দারোগা তাঁকে দেখে ভারী খুশি হয়ে বললেন, "আরে, আসুন, আসুন রসময়বাবু, ভাল কথা, কিছু মনে পড়ল নাকি? আপনার কাছে ভাল-ভাল কথা শুনব বলেই বসে আছি। তা বলুন তো মশাই, কয়েকটা মোক্ষম ভাল কথা।"

রসময় প্রথমে মাথা চুলকোলেন, তারপর হাত কচলে বললেন, "আজ্ঞে বড়বাবু, ভাল কথা কিছুই মনে আসছে না।"

"আহা, একটু বসুন, একটু ভাবুন, ঠিক মনে পড়ে যাবে।"

"যে আজ্ঞে। তবে কিনা বসার একটু অসুবিধে আছে।"

"কেন বলুন তো! ফোড়া-টোড়া হয়েছে নাকি? কিংবা হাঁটুতে বাত?"

ভারী বিনয়ের সঙ্গে রসময় বললেন, "আজ্ঞে, সে বরং ভাল ছিল। এ তার চেয়েও মারাত্মক। জগাপাগলা তার ঝোলার মধ্যে একখানা বোমা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"সর্বনাশ! আবার বোমা! এই কি আপনার ভাল কথা? বোমা সে পেল কোথায়?"

"আজ্ঞে, পরেশবাবু বলে কে একজন মাঝরাতে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে গছিয়ে গেছে।"

মদন হাজরা আতঙ্কিত হয়ে বললেন, "সর্বনাশ? আবার এগারোজন পরেশবাবুকে ধরে আনতে হবে নাকি! এ তো বড় ঝামেলাই হল দেখছি! জানেন মশাই, এগারোজন বামাচরণ আমার নামে মানহানির মামলা করবে বলে উঁকিলের চিঠি দিয়েছে। শুধু কি তাই? সবুজ চেক লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা সাতটা লোক রোজ এসে ক্ষতিপূরণের জন্য ঘ্যানঘ্যান করছে।"

"খুবই দুঃখের কথা বড়বাবু, আপনাদের জীবনটাই তো এরকম। পরের জন্য এত করেন, তবু কেউ গুণের কথা বলে না। কেবল দোষ খুঁজে বের করে।"

"বাঃ! এই তো একটা ভাল কথা বললেন! বাঃ বাঃ! এ তো চমৎকার কথা! শুনে মনটা ভাল হয়ে গেল মশাই। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন!"

"আজ্ঞে, জগাপাগলার ঝোলার মধ্যে একখানা মিলিটারি বোমা ফাটো-ফাটো করছে। এই ফাটে কি সেই ফাটে অবস্থা।"

মদন হাজরা লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "কোথায় জগা? অ্যাাঁ! কোথায় সে? ওরে গুলবাগ সিং, সেপাই-টেপাই নিয়ে যা তো বাবা, ব্যাটাকে একেবারে হাতকড়া দিয়ে ধরে আন।"

রসময় হাত কচলে বললেন, "আজ্ঞে বড়বাবু, জগাকে ধরে আনলে তেমন কাজ হবে না। বরং কাজটা কেঁচে যাবে।"

মদন হাজরা ধপ করে বসে পড়ে বললেন, "আপনি বোধ হয় আরও একটা ভাল কথা বলতে চাইছেন! তা হলে বলেই ফেলুন।"

"আজ্ঞে, ভাল কিনা জানি না। আমাদের মাথায় যা আসে বলে ফেলি। তা ভাল না মন্দ সেটা আপনার মতো দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা বিচার করবেন।"

মদন হাজরা খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ এটাও ভাল কথা। এবার বলুন।"

"বলছিলাম কি, ধরপাকড় না করে বরং জগার ওপর নজর রাখলে ওই পরেশবাবু বা বামাচরণ যে-ই হোক, তাকে ধরে ফেলা যাবে। জগা নির্দোষ, বোমা বন্দুক সে চেনে না। তাকে পাগল পেয়ে কেউ আড়াল থেকে এসব করাচ্ছে।"

মদন হাজরা ভাবিত হয়ে বললেন, "হুম, তা লোকটা কে?"

"হয় বামাচরণ, নয় তো পরেশবাবু।" গগনবাবুর বাড়ির বোমাটা যে জগাপাগলাই রেখে এসেছিল তা আর রসময় ভাঙলেন না। তা হলে জগার কপালে দুঃখ ছিল।

মদন হাজরা দুলে-দুলে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "খুবই চিন্তার কথা। কিন্তু বোমাটা যে ওর কাছে রয়েছে, সেটা যে সরানো দরকার। গ্রেফতার না করলে-"।

রসময় ঘাড় চুলকে ভারী বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আজ্ঞে, জগা আজ ফটিকবাবুর বারান্দায় শুয়েছে। আমাকে যদি দশ মিনিট সময় দেন তা হলে আমি গিয়ে বোমাটা সরিয়ে ফেলব। অবশ্য যদি আপনার মত থাকে।"

মদন হাজরা একগাল হেসে বললেন, "খুব মত আছে। খুব মত আছে। বোমাটোমা থানায় রাখা বড্ড ঝকমারি মশাই। আপনি বরং বেরিয়ে পড়ুন। আমরা আধঘণ্টা বাদে যাচ্ছি।"

"যে আজ্ঞে," বলে রসময় বেরিয়ে পড়লেন।

বেশ জোর কদমেই হেঁটে যাচ্ছিলেন রসময়। ফটিকবাবুর বাড়ির কিছু আগে হাপু ডাইনির মোড়। জায়গাটা খুব নির্জন। চারদিকে ঝোঁপঝাড়।

হঠাৎ কে যেন অন্ধকার থেকে বলে উঠল, “ঠাকুরমশাই নাকি?”

রসময় বললেন, “হ্যাঁ।”

“একটু উপকার করতে হবে যে ঠাকুরমশাই। আমার বাড়িতে

নাকি?

আজ লক্ষ্মীপুজো, দুটো ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে যেতে হবে যে!”

“পাগল নাকি? আমি আজ বড় ব্যস্ত। জীবন-মরণ সংশয় হে বাপু, ওই পাঁচালি-টাঁচালি পড়ে চালিয়ে নাওগে যাও। আমার আজ সময় হবে না।”

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। লণ্ঠনের আওতার বাইরে একটা ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়ানো। বলল, “তাই কি হয়? আমার বউ যে সকাল থেকে নির্জলা উপোস করে বসে আছে। পুজো না হলে জলটুকুও খাবে না।”

রসময় বললেন, “তা সেটা আগে বলোনি কেন? হঠাৎ করে এসে পথ আটকালে তো হবে না! আমি জরুরি কাজে যাচ্ছি।”

“আজ্ঞে, এ কাজটাও কম জরুরি নয়। মালক্ষ্মী কূপিত হলে তো শুধু আমাদের ওপরেই হবেন না, পূজারীর ওপরেও হবেন। ঠাকুরমশাইয়ের কি সর্পভয়ও নেই নাকি?”

“ওঃ, জ্বালালে দেখছি!”

“আজ্ঞে, বেশিক্ষণ তো নয়। পাঁচটা মিনিট একটু অংবং বলে দুটো ফুল ফেলে চলে আসবেন।”

"ঠিক আছে বাপু, চলো। তা তোমার বাড়িটা কোথায়?"

"এই যে এদিকে।"

লণ্ঠনের আলোটা বড়ই কমজোরি। তাতে লোকটাকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। আগে-আগে হাঁটছে। পথ ছেড়ে একেবারে মাঠঘাট দিয়ে চলেছে।

"কই হে? কোথায়?" রসময় হাঁক মারলেন। "এই যে আর একটু।" হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ রসময় থমকে দাঁড়ালেন। "সর্বনাশ!"

৬. ফটিকবাবুর বারান্দাটা বেশ চওড়া

ফটিকবাবুর বারান্দাটা বেশ চওড়া। জগা তার চট আর ছেঁড়া চাঁদরখানা যত্ন করে পেতে বিছানা করে ফেলল। ঝোলাখানাকে বালিশ করে শুয়ে পড়লেই হল! আজ মহেশবাবুর মায়ের কী একটা পুজো ছিল। ভরপেট খিচুড়ি খাইয়েছে। পেট ঠাণ্ডা থাকলে ঘুমটাও বেশ ভাল হয়।

জগা একটা হাই তুলল, তারপর স্বপ্নের কলটা ঝোলা থেকে বের করে মাথার পাশে রেখে শুয়ে পড়ল। পরেশবাবু কলটা ভুলই দিয়েছেন। জিলিপির বদলে জিবেগজার কল। তা হোক, জিবেগজাও তার দিব্যি লাগে।

এসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে যখন ঘুমটা বেশ ঘনিয়ে আসছে সেই সময়ে লোকটা এল। "এই যে জগা! কী খবর?"

জগা বিরক্ত হয়ে বলল, "ইস জিবেগজার স্বপ্নটা এইবারই শুরু হতে যাচ্ছিল, তা দিলেন তো বারোটা বাজিয়ে?"

লোকটা অবাক হয়ে বলল, "জিবেগজা! জিবেগজা হবে কেন? জিলিপি নয়?"

জগা এবার টপ করে উঠে বসে বলল, "আপনি কি পরেশবাবু?"

"হ্যাঁ, আমিই পরেশবাবু, তবে অনেকে নফরচন্দ্রও বলে।"

জগা খুশি হয়ে বলে, "আজ্ঞে, কলটা আপনি ভুলই দিয়েছেন বটে! এটা মোটেই জিলিপির কল নয়, জিবেগজার কল।"

"এঃ হেঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো তা হলে! দাও তা হলে ওটা বদলে দিই।"

"জিবেগজাও বেশ লাগছে কিন্তু!"

"আরে দূর! এবার তোমাকে রাজভোগের কল দিয়ে যাব। রাজভোগের কাছে কি আর জিবেগজা বা জিলিপি লাগে?"

"তা সত্যি! রাজুভোগ হলে তো কথাই নেই।"

"তা ইয়ে, সেই কলটা গগনবাবুর ঘরে রেখে আসতে পারোনি বুঝি!"

"আজ্ঞে কী করি বলুন! কুকুরে এমন তাড়া করল যে, পালিয়ে বাঁচি না, তা বাগানে ফেলে এসেছিলুম। তারপর কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে।"

লোকটা ভালমানুষের মতো বলল, "তাতে কী? এবার এমন ব্যবস্থা করে দেব যে, আর কাজ ভণ্ডুল হওয়ার জো নেই। এই যে দেখছ আমার হাতে, এটা হল ভূতযন্ত্র।"

জগা অবাক হয়ে দেখল, লোকটার হাতে কালোমতো বিটকেল একটা যন্তর বটে!

জগা বলে, "আজ্ঞে দ্রব্যটা কী?"

"এর ভেতর থেকে ভূত বেরোয়।"

"ওরে বাপ রে!"

"ভয় পেয়ো না। যন্ত্র যার হাতে থাকে ভূত তার ক্ষতি করে।"

"বটে!"

"এই যন্তরটা নিয়ে রাত নিশুত হলে গগনবাবুর বাড়িতে যাবে। দক্ষিণের ঘরে গগনবাবু শোয়। জানো তো?"

"খুব জানি।"

পরেশবাবু খিকখিক করে হেসে বললেন, "এবার আর স্বপ্ন নয়, গগনবাবুর ঘরে একেবারে জ্যান্ত ভূত ছেড়ে দিয়ে আসবে। এই যে দেখছ নল, এটা গগনবাবুর মাথার দিকে তাক করে এই যে ঘোড়াটা দেখছ এটা টিপে ধরবে। অমনই দেখবে একটা ঝলকানি দিয়ে আর শব্দ করে যন্ত্র থেকে ভূতের পর ভূত গিয়ে ঘরের মধ্যে কেমন নাচানাচি আর লাফালাফি করে। ব্যস, ওখানে কয়েকটা ভূত ছেড়ে দিয়েই পালিয়ে আসবে।"

জগা মাথা চুলকে বলল, "কুকুরটা যে তেড়ে আসে মশাই। আমি কুকুরকে বড্ড ভয় পাই।"

"সেই ব্যবস্থাও আছে। এই যে প্লাস্টিকের ব্যাগে একটুকরো মাংস দেখছ, কুকুরটা এলেই মাংসের টুকরোটা বের করে ছুঁড়ে দিয়ো। খেয়েই কুকুরটা নেতিয়ে পড়বে। তারপর আর ভয়টা কাকে? ভূতটা ছেড়ে দিয়েই চলে আসবে, পারবে না? সোজা কাজ। আর এই নাও কুড়িটা টাকা, কাল ভূপতির দোকানে গরম-গরম লুচি আর হালুয়া খেয়ো।"

জগা খুশি হয়ে টাকাটা ট্যাঁকে খুঁজে বলল, "খুবই সোজা-সোজা কাজ দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে শক্ত কাজও দেবেন।"

"এক আর বেশি কথা কী? তোমার মতো যোগ্য লোক আর আছেটাই বা কে! তা আজ রাতেই একটা শক্ত কাজ করবে নাকি? যদি করো তো আরও কুড়িটা টাকা আগাম দিয়ে যাই।"

"আজ্ঞে, কী যে বলেন! শক্ত কাজ না পারার কী আছে মশাই! সারাদিন আমি কত শক্ত-শক্ত কাজ করে বেড়াই। এই ধরুন, গাছে উঠে পড়লুম, ফের নেমে এলুম। তারপর ধরুন এই এত বড় একটা ঢিল তুলে ওই দূরে ছুঁড়ে দিলুম। তারপর ধরুন, দুধসায়র থেকে ঘটির পর ঘটি জল তুলে ফের দুধসায়রেই ঢেলে দিলুম।"

"বাঃ, এসব তো অতি কঠিন কাজ।"

"তা হলেই বলুন।"

"বলেই ফেলি তবে, কেমন? গগনবাবুর ঘরে ভূত ছেড়ে দিয়েই তুমি ভূত-যন্ত্রটা নিয়ে সোজা রাজবাড়িতে চলে যাবে।"

"তা গেলুম।"

"গিয়ে হরুয়া আর তার ভাই কেলোকে দেখতে পাবে। রাতে দু'জনেই থাকে। যন্ত্রটা তুলে ঘোড়া টিপে ধরে থাকবে, দেখবে গোল্লা-গোল্লা ভূত গিয়ে ওদের এমন তাড়া করবে যে, ভয়ে দুজনে মাটিতে কুমড়ো-গড়াগড়ি যাবে। সেই ফাঁকে হয়ার ট্যাঁক থেকে চাবিটা সরাতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না। হবে নাকি?"

"আরে না, না, এ তো সোজা কাজ।"

"ব্যস, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। চাবিটা হাতে নিলেই আমি হাজির হয়ে যাব।"

জগা একটু ক্ষুব্ধস্বরে বলল, "কেন, শুলটা নিয়ে গিয়ে দুধসায়রের দ্বীপে রেখে আসতে হবে না? বামাচরণবাবুর সঙ্গে সেরকমই তো কথা ছিল।"

"না, না, সেসব আমিই করব' খন।"

"তা হলে কাজটা যে বেজায় সোজা হয়ে যাচ্ছে!"

পরেশবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বলেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখব' খন।"

"ভাবাভাবির কী আছে পরেশবাবু? পটল জেলের নৌকোটা ঘাটে বাঁধাই থাকে। শুলটা নৌকোয় চাপিয়ে বৈঠা মেরে পৌঁছে দেব' খন।"

পরেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর দেরি করা ঠিক হবে না হে জগা। রওনা হওয়া যাক।"

“এই যাচ্ছি। আচ্ছা পরেশবাবু, আপনি লম্বা না বেঁটে?”

“কেন বলো তো?”

“ঠাকুরমশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন। তা আমি বললুম, বেঁটে। কিন্তু উনি বলছেন, লম্বা। কোনটা ঠিক?”

“তোমার কথাই ঠিক। আমি বেজায় বেঁটে। তা হলে এবার বেরিয়ে পড়ো হে।”

“যে আজ্ঞে।” বলে যন্ত্র হাতে নিয়ে জগা রওনা হতেই পরেশবাবু টপ করে ঝোলা থেকে বোমাটা বের করে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আরও মিনিটদশেক বাদে হাঁফাতে-হাঁফাতে রসময় এসে হাজির হলেন। একটু দেরিই হয়ে গেছে তাঁর। লোকটা তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে মেঠো রাস্তায় অনেকদূর নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। আচমকাই রসময়ের খেয়াল হল, এটা একটা কৌশল নয় তো! তাঁকে বেকায়দায় ফেলে অন্যদিকে কাজ বাগিয়ে নেওয়ার মতলব। বুঝতে পেরেই তিনি আর দাঁড়াননি। তবে পথে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে এবং রাস্তা ভুল করে একটু সময় বেশিই লেগে গেল।

রসময় জগাকে তার বিছানায় না দেখে আশপাশে খুঁজলেন। লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে কোথায় আর খুঁজবেন!!

বেশ কয়েকবার, “জগা, জগা!” বলে হাঁক মারলেন। কারও সাড়া পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি গিয়ে জগার ঝোলাটায় হাত ভরে দেখলেন, বোমাটাও নেই।

কপাল চাপড়ে রসময় আপনমনেই বললেন, “নিয়তি কেন বাধ্যতে।”

সঙ্গে-সঙ্গে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল রসময়ের পায়ের কাছে।

মদন হাজরা বলে উঠলেন, “কী শ্লোকটা বললেন ঠাকুরমশাই?”

"এই আজ্ঞে বলছিলুম কি, নিয়তি কেন বাধ্যতে।"

"আহা হা, অপূর্ব! অপূর্ব! এইসব ভাল-ভাল কথা ছাড়া কি আপনাকে মানায়! লাখ কথার এক কথা। আমিও তো তাই বলি, ওরে পাপীতাপীরা, নিয়তি কেন বাধ্যতে। তোদের নিয়তিই তোদের খাবে রে বাপু! তবে কেন যে আমাদের এত হয়রান করিস, এত দৌড়ঝাঁপ করাস, হেদিয়ে মারিস, তা বুঝি না বাবা। ঠিক নয় ঠাকুরমশাই?"

"আজ্ঞে, আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আপনার মুখ থেকে কি ভুল কথা বেরোতে পারে?"

"তা আপনার জগা কোথায়? "সেটাই তো সমস্যা। তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তার মানে! সে গেল কোথায়?"

রসময় সরু গলায় বললেন, "বড়বাবু, আমার মনটা বড় কু গাইছে।"

"কু গাইছে! তার মানে কী?"

"আজ্ঞে, খারাপ কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে।"

"ওঃ তাই বলুন! আমি ভাবলাম এই রাতে আপনার বুঝি গানবাজনার শখ হল। কিন্তু কু গাইছে কেন?"

"আজ্ঞে, আমি বড় ভিতু মানুষ, আপনার মতো ডাকাবুকো নই। তো! অল্পেই বড় ঘাবড়ে যাই। তা ইয়ে, জগার ঝোলার মধ্যে বোমাটাও নেই।"

"অ্যাঁ! তা হলে কি সে বোমা নিয়ে খুনখারাপি করতে বেরিয়ে পড়েছে? এ তো বিপদের কথা হল মশাই! ওরে, তোরা সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়, জগাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

সেপাইরা তাড়াতাড়ি যে যেদিকে পারে দৌড় লাগাল।

মদন হাজরা রসময়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা ঠাকুরমশাই, ভূত বলে কি কিছু আছে?"

রসময় অবাক হয়ে বলেন, "আজ্ঞে, কখনও দেখিনি। তবে আছে বলেই তো শুনি। কেন বলুন তো বড়বাবু?"

মদন হাজরা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি ভূতটুতে মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু কয়েকটা ছেলে গতকাল বাতাসা দ্বীপে পেয়ারা পাড়তে গিয়েছিল। সেখানে নাকি তারা একটা লম্বা সাদা ভূত দেখে ভয়ে পালিয়ে আসে। এদের মধ্যে আমার ছেলেও ছিল। কয়েকজন জেলেও বলছে, তারা দুধসায়রে মাছ ধরার সময় একটা ঢ্যাঙা ভূতকে বাতাসা দ্বীপে দেখতে পায় মাঝে-মাঝে। ভয়ে আর কেউ দ্বীপটার কাছে যায় না। ভাবছি, কাল একবার সরেজমিনে হানা দিয়ে দেখে আসি।"

"যে আজ্ঞে। গেলেই হয়। তবে কিনা আপনাকে যেতে দেখলে ভূত কি আর বাতাসা দ্বীপে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে থাকবে বড়বাবু? তারও কি ভয়ডর নেই।"

"পালাবে বলছেন?"

মাথা নেড়ে রসময় বললেন, "ভূতপ্রেত বলে তো আর তাদের ঘাড়ে দুটো করে মাথা গজায়নি যে, আপনার সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাবে।"

কথাটায় বাড়াবাড়ি থাকলেও মদন হাজরা খুশিই হলেন। বললেন, "তা হলে আর গিয়ে লাভ কী?"

"কিছু না, কিছু না।"

বাতাসা দ্বীপের ভূতের কথা রসময়ও জানেন। তিনি এও জানেন, মদন হাজরা গিয়ে হাল্লা মাচিয়ে যা করবেন তাতে ভূতের কিছুই হবে না। বরং সাবধান হয়ে যাবে।

মদন হাজরা বিদায় নেওয়ার পর রসময় বারান্দায় বসে গভীর চিন্তা করলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা কিছু যেন টিকটিক করছে। ঠিক করতে পারছেন না।

জগাপাগলাকে পিস্তল দেওয়া হল বাঘ মারার জন্য? নাকি মানুষ মারার জন্য? শূলটা চুরি করতে গেলে জগাপাগলাকে গুলি চালাতেই হত। তা হলে কে মারা পড়ত? হরুয়া। বোমাটা গগনবাবুর ঘরে রেখে আসতে বলা হয়েছিল। কে মারা পড়ত? গগনবাবু। তা হলে একটা লোক কি আড়ালে থেকে দু-দুটো লোককে খুন করাতে চায়? তবে নিজে করছে না কেন? বোমা পিস্তল যখন আছে, তখন নিজেই তো খুন করতে পারে, জগাকে কাজে লাগাতে চাইছে কেন?

ভাবতে-ভাবতে মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেল।

জগা এখনও আসছে না। বোমাটাও ঝোলায় নেই। তা হলে কি জগাকে ফের কাউকে খুন করতে পাঠানো হল? এখানে এসে পৌঁছতে রসময়ের অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার কারণ একটা লোক তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে অনেক দূরে নিয়ে ফেলেছিল। ওই লোকটাই কি পরেশবাবু? কিংবা বামাচরণ? ইতিমধ্যে পরেশবাবু কিংবা বামাচরণ এসে কি জগার মাথায় আরও একটা আষাঢ়ে গল্প ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে?

রসময় তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তিনি কি আগে হরুয়ার কাছে যাবেন? না কি গগনবাবুর কাছে? রসময় প্রথমটায় হরুয়ার কাছে যাবেন বলে রাজবাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। তারপর ভাবলেন হরুয়া ডাকাবুকো লোক, রাত জেগে পাহারা দেয়। সুতরাং তার তো ভয় নেই। কিন্তু গগনবাবু বুড়ো মানুষ, ঘুমোচ্ছেন, তাঁরই বিপদ বেশি।

রসময় ফিরে গগনবাবুর বাড়ির দিকেই দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলেন। লণ্ঠন নেভানো, পথও অন্ধকার বলে রসময় খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছেন না। তবুও যথাসাধ্য পা চালিয়ে প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লেন।

তারপরই হাঁক মারলেন, "জগা?"

সঙ্গে সঙ্গে কে একটা লোক উলটোদিক থেকে এসে তাঁর ঘাড়ে সবেগে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেলেন রসময় চক্রবর্তী। মাজায় এমন মট করে উঠল যে, বলার নয়। কনুই। দুটোও ব্যথায় ঝনঝন করে উঠল।

অন্ধকারে লোকটা বলে উঠল, "দেখতে পান না? কানা নাকি?"

রসময়ের কানে গলার স্বরটা চেনা-চেনা ঠেকল। কার গলা এটা? আরে! এই লোকটাই না তাঁকে লক্ষ্মীপুজোর নাম করে ভুলিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল?

রসময় লোকটাকে একবার দেখতে চান। তাই কৌশল করে কাতর কণ্ঠে বললেন, "ওঃ বড্ড লেগেছে। একটু ধরে তুলবেন মশাই?"

"আহা! আমার কি কম লেগেছে নাকি?"

লোকটাকে ভাল করে চিনে রাখা দরকার। তাই রসময় বললেন, "অন্তত দেশলাই-টেসলাই থাকলে দিন না! লণ্ঠনটা একটু জ্বালি।"

"না মশাই, দেশলাই আমার কাছে থাকে না।"

রসময় আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। ব্যথা-বেদনা উপেক্ষা করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে লোকটাকে জাপটে ধরতে গেলেন। যা থাকে বরাতে!

কিন্তু লোকটা হঠাৎ নিচু হয়ে মাথা দিয়ে তাঁর পেটে সজোরে একটা ছুঁ মেরে হাওয়া হয়ে গেল। রসময় ফের পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগলেন। এবার দুনো চোট।

আর পড়ে থেকেই শুনতে পেলেন, গগনবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে। ট্যারারা-ট্যাট-ট্যাট ... ট্যারা রা-ট্যাট-ট্যাট ...। সঙ্গে একটা কুকুরের ভয়ঙ্কর চিৎকার।

কিসের শব্দ তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে এ যে ভাল জিনিসের শব্দ নয়, তা বুঝতে বেশি বুদ্ধি লাগে না। শব্দটা অবশ্য মাত্র কয়েক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হল না। তারপরেই কে একটা হুড়মুড় করে ধেয়ে এল এবং চোখের পলকে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রসময় কপাল চাপড়ালেন। যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। কষ্টেসৃষ্টে উঠলেন রসময়, সর্বাঙ্গে ব্যথা, তবু যথাসাধ্য ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে গগনবাবুর বাড়ির বাগানের ফটক খুলে ঢুকলেন।

৭. আজ পুটু খাসনবিশের সঙ্গে

আজ পুটু খাসনবিশের সঙ্গে পুকুরে সাঁতার শিখতে নেমেছিল। জলে তার খুব ভয়। তবে খাসনবিশ খুব পাকা লোক। প্রথম কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার পর খাসনবিশ তাকে একটু গভীর জলে নিয়ে গিয়ে পট করে ছেড়ে দেয়। তখন ভয় খেয়ে এমন হাত-পা ছুঁড়েছিল পুটু যে, বলার নয়। চিৎকারও করেছিল। তাই দেখে গুটকের সে কী হাসি!

কিন্তু ওই একবারেই সাঁতারটা শিখেও গেল সে। তারপর অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে চোখ লাল করে ফেলল। খাসনবিশ জোর করে তুলে না আনলে পুটুকে আজ জল থেকে তোলাই যেত না।

সাঁতার শিখে আজ পুটুর এমন আনন্দ হল যে, সারাটা দিন তার যেন পাখা মেলে উড়তে ইচ্ছে করছিল। সাঁতার যে এত সোজা জিনিস তা এতকাল জানত না সে।

দুপুরে খাওয়ার সময় সে দাদুকে সাঁতার শেখার গল্পটা খুব জাঁক করে বলছিল।

কিন্তু দাদু ভারী অন্যমনস্ক। কেবল হুঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন। "ও দাদু, তুমি খুশি হওনি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছি।"

"তবে হাসছ না যে!"

"হাসিনি। ও, আচ্ছা, এই যে হাসছি।"

"ওটা হাসি হল? মুখ ভ্যাংচানো হল তো?"

গগনবাবু এবার সত্যিই একটু হেসে বললেন, "কী জানো ভাই, আজ আমার মনটা ভাল নেই।"

"কেন নেই দাদু?"

"ঘটনাটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না যে?"

"কোন ঘটনা দাদু?"

"ভাবছি আমার বাড়িতে বোমা রেখে গেল কে? আমার এমন শত্রু কে আছে? তার ওপর মিলিটারির হ্যান্ডগ্রেনেড। গাঁয়ের লোক এ-জিনিস পাবে কোথায়?"

পুটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না দাদু। আমার তো এয়ার পিস্তল আছে। আজ রাতে আমি বাড়ি পাহারা দেব।"

গগনবাবু একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন, "তা দিয়ো, তবু দুশ্চিন্তাটা যাচ্ছে না।"

আজ বিকেলে অনেক লোক এসে গগনবাবুর কাছে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে গেছে। রামহরিবাবু তো বলেই ফেললেন, "এর পর তো দেখব শীতলাতলার হাটে অ্যাটম বোমা বিক্রি হচ্ছে। দিনকালটা কী পড়ল বলুন তো! জগার হাতে পিস্তল! আপনার বাগানে বোমা! এ তো ভাল কথা নয়!"

হরিশবাবু বললেন, "একে রামে রক্ষে নেই। সুগ্রীব দোসর। ওদিকে ভূতের উৎপাতও নাকি শুরু হয়েছে। বাতাসা দ্বীপের ঢ্যাঙা ভূতটা নাকি ডাঙাতেও হানা দিচ্ছে আজকাল।"

স্কুলের বিজ্ঞানশিক্ষক ব্যোমকেশবাবু বললেন, "ভূতটুত সব বাজে কথা। লম্বা লোকটা মানুষই বটে! শীতলাতলার হাটে তাকে অনেকেই দেখেছে। লোকটার নাম শিবরাম নস্কর, নয়াগঞ্জে বাড়ি, হাটে-হাটে গামছা ফিরি করে বেড়ায়।"

এই নিয়ে একটা তর্কও বেধে উঠল বেশ। রামহরিবাবু বললেন, "এ, খুব ঢ্যাঙা দেখালেন মশাই! শিবরাম নস্করকে

আমিও চিনি। ও আবার লম্বা নাকি? অজিত কুণ্ডুকে তো দেখেননি। বাজিতপুরে বাড়ি। সেও হাটে আসে মাঝে-মাঝে। শিবরাম তো তার কোমরের কাছে পড়বে।”

মনসাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “উঁহু উঁহু, অজিত কুণ্ডু লম্বা বটে, কিন্তু সাতকড়ির কাছে কিছু নয়। পয়সাপোঁতা গাঁয়ের সাতকড়ি গো, আমাদের শিবগঞ্জের শিবেনের জামাই। সে তো হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে নারকেল পারতে পারে, গাছে উঠতে হয় না।”

ব্যোমকেশবাবু টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, “কথাটা লম্বা নিয়ে নয়, ভূত নিয়ে। কথা হল, বাতাসা দ্বীপে একটা ঢ্যাঙা ভূতের কথা শোনা যাচ্ছে। যারা মাছ-টাছ ধরতে যায় তারা নাকি দেখেছে। তা গাঁয়েগঞ্জে এরকম ভূত দেখা নতুন কিছু নয়। এসব কুসংস্কার ভেঙে ফেলা দরকার।”

রামহরি খিঁচিয়ে উঠে বললেন, “আপনি কি বলতে চান ভূত নেই!”

ব্যোমকেশবাবু বুক চিতিয়ে বললেন, “নেই-ই তো।”

“তা হলে বলি, আপনার বিজ্ঞান-পড়া বিদ্যে দিয়ে ওসব বুঝতে পারবেন না। সাহস থাকলে নীলগঞ্জে প্রতাপরাজার বাগানবাড়িতে একটা রাত কাটিয়ে আসুন, বিজ্ঞান ভুলে রাম নাম নিতে পথ পাবেন না। শুনেছি সেখানে প্রতি রাতে ভূতের জলসা হয়। গানাদার বাজনদার ভূতরা সব আসে।”

“ওঃ, যত্ত সব।” বলে ব্যোমকেশবাবু রাগ করে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

তা সে যাই হোক, বয়স্ক মানুষদের ঝগড়া শুনতে পুটুর খুব ভাল লেগেছিল আজ। সে হিহি করে হাসছিল। কিন্তু দাদুর মুখে হাসি নেই।

মহেশবাবু ভালমানুষ। তিনি কোনও ঘটনার খারাপ দিকটা দেখতে পছন্দ করেন না। বললেন, “আচ্ছা, ধরুন, এমনও তো হতে পারে, বিদ্যাধরপুরের ওপর দিয়ে নিশুত রাতে পথ ভুলে কোনও এরোপ্লেন যাচ্ছিল। ধরুন, প্লেনের পাইলটের খুব ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

সে হয়তো ঘুম চোখে বোমা ফেলার বোতামটা টিপে দিয়েছিল। ঘুম চোখে ভুল তো হতেই পারে। আর সেই বোমাটাই এসে গগনবাবুর বাগানে পড়েছে। হয়তো বোমাটা মেঘের ভেতর দিয়ে আসার সময় ভিজে সেঁতিয়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের ভাগ্যে ফাটেনি। হতে পারে না এরকম?”

রামহরিবাবু বললেন, “হতে পারবে না কেন? তবে হয়নি।”

গগনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, “এরোপ্লেন থেকে এ ধরনের বোমা ফেলা হয় না মহেশবাবু।”

দাদুর মুখে একটুও হাসি না দেখে আজ পুটুর মনটা বড্ড খারাপ লাগছিল। গাঁয়ের লোকেরা বিদেয় হলে সে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, “তুমি এত ভাবছ কেন দাদু? কী হয়েছে?”

গগনবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “অনেক কথা ভাবছি দাদু। একটা গভীর ষড়যন্ত্র। নইলে প্রতাপরাজার শুলটা হাতাতে চাইবে কেন? বুঝলে ভাই, আমার মনটা আজ সত্যিই ভাল নেই।”

রাতে যখন পুটু খেয়েদেয়ে মায়ের পাশে শুতে গেল, তখনও দাদুর গম্ভীর মুখটা সে ভুলতে পারছে না। বিদ্যাধরপুরে এলে দাদুই তার সারাদিনের সঙ্গী। কত গল্প হয়, হাসিঠাট্টা হয়, খেলা হয় দাদুর সঙ্গে। কিচ্ছু হচ্ছে না সকাল থেকে।

পুটু হয়তো ঘুমিয়েই পড়ত, কিন্তু সাঁতার কেটে আজ তার হাত-পায়ে খুব ব্যথা। মা ঘুমিয়ে পড়ার পরও সে অনেকক্ষণ জেগে রইল। তারপর ভাবল, উঠে বরং বাড়িটা পাহারা দিই।

সে গিয়ে প্রথমেই খাসনবিশকে জাগাল, “ও খাসনবিশদাদা, ওঠো! ওঠো!”

খাসনবিশ প্রথমটায় উঠতে চায় না। ঠেলাঠেলি করায় হঠাৎ একসময়ে জেগে সটান হয়ে বসে বলল, "কী! কী! হয়েছেটা কী? আবার বোমা নাকি? উরেব্বাস! আবার বোমা! নাঃ, এবার আমি বৃন্দাবন চলে যাব!"

পুটু হিহি করে হেসে বলল, "ভয় পাচ্ছ কেন? এবার কেউ বোমা ফেলতে এলে এই দ্যাখো আমার পিস্তল। ঠাঁই করে গুলি চালিয়ে দেব।"

নিজের এয়ার পিস্তলটা তুলে খাসনবিশকে দেখাল পুটু। খাসনবিশ বলল, "ওরে বাবা, এয়ার পিস্তল দিয়ে কি আর ওদের ঠেকানো যাবে?"

পুটু খাসনবিশকে ঘুমোতে দিল না। জোর করে বাড়ির বারান্দায় এসে দুটো চেয়ারে বসল দুজনে।

"একটা ভূতের গল্প বলো তো খাসনবিশদাদা।"

খাসনবিশ একটা হাই তুলে গল্পটা সবে ফাঁদতে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে, টমি কুকুরটা ঘাউ-ঘাউ করে গেটের দিকে তেড়ে গেল।

খাসনবিশ আঁতকে উঠে বলল, "ওই রে! এসে গেছে বোমারু!"

পুটু ভয় খেল না। পিস্তলটা তুলে সে চেয়ার থেকে নেমে গেটের কাছে ছুটে গিয়ে আবছা অন্ধকারে একটা লোককে দেখতে পেল।

লোকটা একটা ছোট বন্দুকের মতো জিনিস বাগিয়ে ধরে আছে। অন্য হাতে একটা কী জিনিস দোলাতে-দোলাতে টমিকে বলছে, "আয়, আয়, খাবি আয়।"

গোয়েন্দা-গল্পে কুকুরকে বিষ-মেশানো খাবার খাওয়ানোর গল্প অনেক পড়েছে পুটু। সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই তুমি কে? কী চাই?"

লোকটা ভয় পেল না। বলল, "রোসো বাপু, রোসো। অত চেঁচামেচি কোরো না। আমি ভূত ছাড়তে এসেছি। অনেক শক্ত কাজ আছে হাতে। আগে এই মাংসের টুকরোটা তোমাদের কুকুরটাকে খাওয়াতে হবে। তারপর ভূত ছাড়তে হবে। তারপর আরও আছে।"

বলে লোকটা টমির দিকে মাংসের টুকরোটা ছুঁড়ে দিতেই পুটু চেঁচাল, "অ্যাই খবর্দার!"

বলেই সে তার পিস্তল চালিয়ে দিল।

"বাপ রে! মরে গেলুম রে!" বলে লোকটা চেঁচাতে শুরু করতেই চারদিক প্রকম্পিত করে লোকটার হাতের বন্দুকটা থেকে ফুলঝুরির মতো গুলি ছুটতে লাগল।

পুটু দাদুর কাছে মিলিটারির অনেক কায়দা শিখে নিয়েছে। গুলি চলতেই সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর টমি ভয় পেয়ে ভীষণ চেঁচাতে লাগল।

লোকটা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই দৌড়ে পালিয়ে গেলে পুটু উঠে মাংসের টুকরোটা তুলে দেওয়ালের বাইরে ফেলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল, রাস্তার কুকুররা বা কাকটাকেরা যদি খায়?

বিকট শব্দে বাড়িসুদ্ধ লোক উঠে পড়েছে। গগনবাবু বেরিয়ে এসে থমথমে মুখ করে সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে নাতিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ বটে, কিন্তু খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ। খাসনবিশের বদলে আমাকে ডেকে নিলেই পারতে! তোমার হাতে ওটা কী?"

"এটা মনে হচ্ছে বিষ-মেশানো মাংস। লোকটা টমিকে দিতে চাইছিল।"

"সর্বনাশ! ওরে খাসনবিশ, ওটা মাটিতে পুঁতে ফেল তো এক্ষুনি।"

খাসনবিশ দৌড়ে শাবল এনে বাগানের কোণে মাংসের টুকরোটা পুঁতে দিয়ে এল।

গগনবাবু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ব্যাপারটায় তোমরা ভয় পেয়েছ জানি। বোমার পর স্টেনগান। কেউ আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে চাইছে। কেন চাইছে তা বুঝতে পারছি না। তবে একটা সন্দেহ আমার হচ্ছে। যদি সেই সন্দেহ সত্য হয় তবে বেশ গণ্ডগোলের ব্যাপার।"

ঠিক এই সময়ে রসময় এসে ঢুকলেন। থরথর করে কাঁপছেন। মুখে কথা সরছে না।

গগনবাবু একটু হেসে বললেন, "আসুন ঠাকুরমশাই, মনে-মনে আপনাকেই খুঁজছি। আমার একজন বিচক্ষণ লোক দরকার।"

রসময় কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে বললেন, "বেঁচে যে আছেন এই ঢের। দুগা, দুর্গা।"

"লোকটা কে ঠাকুরমশাই? চেনেন?"

রসময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "চিনি। ও হল জগাপাগলা।"

গগনবাবু অবাক হয়ে বললেন, "জগাপাগলা! বলেন কী ঠাকুরমশাই?"

"ঠিকই বলছি। তবে ওর দোষ নেই। পেছনে অন্য লোক আছে।"

"কে লোক?"

"কখনও তার নাম বামাচরণ, কখনও পরেশবাবু। কিন্তু হাতে আর সময় নেই গগনবাবু। এখনই একবার রাজবাড়ির দিকে যাওয়া দরকার।"

গগনবাবু হঠাৎ টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "শূল! অ্যাাঁ! শূলটা নিয়ে যাবে না তো! চলুন তো, দেখি!"

.

ভূত-যন্ত্রটা হাতে নিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে জগা খুব হাসছিল। গগনবাবুর বাড়ির আশপাশে মেলা ভূত ছেড়ে এসেছে আজ। আর ভূতগুলোর কী তেজ বাপ! আগুনের ঝলক তুলে রে-রে ৭২

করতে করতে সব বেরোতে লাগল। গগনবাবুর ঘরের মধ্যে ছাড়তে পারলে ভাল হত। লোকটা বড় ছ্যাঁচড়া। মেয়ের বিয়েতে জগাকে মোটেই ভাল করে খেতেই দিল না! যা হোক, বাড়ির সামনে যে ভূতগুলো জগা ছেড়ে এল তারা কি আর গগনবাবুকে ছেড়ে কথা কইবে?

নষ্টের গোড়া ওই ছেলেটা এসে যে পিড়িং করে কী একটা জিনিস ছুঁড়ে মারল! জগার কপালের ডানদিকটা এখন ফুলে বড্ড টনটন করছে। রক্তও পড়ছে বটে। তবে আনন্দটাও তো হচ্ছে। কম নয়। শক্ত শক্ত কাজ করতে ভারী আনন্দ হয় জগার।

রাজবাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে তখন কে যেন তার পাশে-পাশে দৌড়তে লাগল। সেই ভূতগুলোর একটা নাকি? অন্ধকারে আবছায়ায় তাই তো মনে হচ্ছে!

জগা চোখ পাকিয়ে বলল, "যাঃ, যাঃ, এখানে কী? যেখানে ছেড়ে এসেছি সেখানে গিয়ে দাপাদাপি কর।"

ভূতটা বেশ বিরক্ত গলায় বলল, "এবারও পারলে না তো?"

"পরেশবাবু যে! ও, ভূত যা ছেড়ে এসেছি আর দেখতে হবে। এতক্ষণে ভূতেরা দক্ষযজ্ঞ লাগিয়ে দিয়েছে গিয়ে দেখুন গগনবাবুর বাড়িতে।"

পরেশবাবু বললেন, "মোটেই তা নয় জগা। ভূতগুলো সব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।"

জগা অবাক হয়ে বলল, "বলেন কী মশাই? মুখ থুবড়ে তো পড়ার কথা নয়!"

পরেশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার ওপর বড় ভরসা ছিল হে! এ-গাঁয়ে তোমার মতো বীর আর কে?"

"আজ্ঞে, সে তো ঠিক কথা।"

"নিজে পারলে অবশ্য তোমাকে কষ্ট দিতাম না। কিন্তু ওইখানেই যে মুশকিল। নিজে হাতে মশা-মাছিটা অবধি মারতে পারি না আমি। সেইজন্যই তো চাকরিটা ছাড়তে হল।"

জগা কথাটার প্যাঁচ ধরতে পারল না। তবে হাসির কথা ভেবে খুব হাসল। বলল, "মশা-মাছি আমি খুব মারতে পারি।"

রাজবাড়ির দেউড়ির উলটো দিকে জগাকে নিয়ে ঠেলে দাঁড় করিয়ে পরেশবাবু বললেন, "এবার যেন ভুল না হয়, দেখো।"

জগা বলল, "না, না ভুল হবে কেন? সোজা কাজ। তবে কাজটা যেন কী পরেশবাবু?"

"ওই যে দেউড়ির বাইরে হরুয়া আর রামুয়া দু'ভাই পাহারা দিচ্ছে দেখেছ? দুজনের হাতেই পাকা বাঁশের লাঠি।"

"ও আর দেখব কী? রোজ দেখছি।"

"তা হলে এবার এগিয়ে যাও। একেবারে কাছাকাছি গিয়ে যন্ত্রটা ভালমতো তাক করে ভূতগুলো ছেড়ে দিয়ে এসো। এবার যেন আর কাজ পণ্ড করে দিয়ো না।"

"না, না, আর ভুল হবে না। তা এর পর আরও শক্ত শক্ত কাজ দেবেন তো পরেশবাবু?"

"মেলা কাজ পাবে। কাজের অভাব কী?"

জগা খুশি হয়ে বলল, "কেউ কাজ দেয় না মশাই, তাই বসে থেকে-থেকে আমার গতরে শুয়োপোকা ধরে গেল। এইসব কাজকর্ম নিয়ে থাকলে সময়টা কাটেও ভাল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার যাও, কাজটা উদ্ধার করে এসো।"

"যে আজ্ঞে!"

ভূত ছাড়া ভারী মজার কাজ। জগা ভূত-যন্ত্রটা বগলে নিয়ে গটগট করে এগিয়ে গেল। কাজ খুবই সোজা। দেউড়ির মাথায় একটা ডুম জ্বলছে। সেই আলোয় হরুয়া আর রামুয়াকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

জগা যন্ত্রটা তুলে ঘোড়া টিপে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গেই আগুনের ঝলক তুলে রাশি রাশি ভূত ছুটে যেতে লাগল হরুয়া আর রামুয়ার দিকে। ভূতগুলোর কী তেজ! কী শব্দ! বাবা রে! যন্ত্রটা তার হাতের মধ্যে লাফাচ্ছে যেন!

দেউড়ির আলোটা চুরমার হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ঝপঝপ করে কী যেন খসে পড়ল। হরুয়া আর রামুয়া বিকট চিৎকার করে উঠল, "বাপ রে! গেছি রে।"

তারপরই জায়গাটা একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

পরেশবাবু পেছন থেকে এসে যন্ত্রটা জগার হাত থেকে নিয়ে বললেন, "বাঃ, এই তো দিব্যি পেরেছ।"

জগা একগাল হেসে বলল, "এ আর এমন কী? তা আর ভূতটুত ছাড়তে হবে না?"

পরেশবাবু যন্ত্রটা একটু নাড়া দিয়ে বললেন, "ভূত শেষ হয়ে গেছে। আবার ভূত ভরলে তবে ভূত ছাড়তে পারবে। এখন চলো, অনেক কাজ আছে।"

পরেশবাবু একটা টর্চ জ্বেলে দেখলেন, হরুয়া আর রামুয়া মাটিতে চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে। দুজনেরই কপাল আর শরীর রক্তে মাখামাখি। পরেশবাবু নিচু হয়ে হরুয়ার ট্যাঁক থেকে একট ভারী চাবির গোছা বের করে নিয়ে বললেন, "এবার শূল!"

জগা হরুয়া আর রামুয়ার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বলল, "আচ্ছা মশাই, ভূতেরা কি এদের মারধর করেছে?"

"তা করেছে।"

"কিন্তু মারধরের তো কথা ছিল না। শুধু ভয় দেখানোর কথা।"

"বে-আদবদের মারধরও করতে হয়। এবার চলো, চটপট কাজ সেরে ফেলি।"

জগার একটু ধন্দ লাগছিল। তার মাথাটাও হঠাৎ যেন ঝিমঝিম করছে। তবু সে পরেশবাবুর পিছু পিছু চলল।

দেউড়ির ফটক ঠেলে পরেশবাবু ঢুকলেন। রাজবাড়ির মস্ত কাঠের দরজা চাবি দিয়ে খুলতে তাঁর মোটেই সময় লাগল না। পরপর কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা ঘরের বন্ধ দরজা খুললেন পরেশবাবু। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ঘরের দেওয়ালে কাঠের স্ট্যান্ডে থরেথরে প্রতাপরাজার অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। বিশাল ধনুক, মস্ত তলোয়ার, প্রকাণ্ড ভল্ল, বিপুল গদা। কোনওটাই মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়, এতই বড় আর ওজনদার সব জিনিস। পরেশবাবুর টর্চের ফোকাসটা স্থির হল শূলটার ওপর। শুলটাও দেওয়ালের গায়ে একটা কাঠের মস্ত স্ট্যান্ডে শোওয়ানো।

"এসো হে জগা, একটু কাঁধ দাও।"

"যে আজ্ঞে!" দুজনে মিলেও শুলটা তুলতে বেশ কষ্টই হল।

শূলটা বয়ে দুধসায়রের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে জগা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা পরেশবাবু, হরুয়া আর রামুয়া মরে যায়নি তো?"

পরেশবাবু চাপা গলায় বললেন, "মরলে তো তুমি বাহাদুর। আজ অবধি আমি কাউকে মারতে পারলাম না, তা জানো? আমার ওই একটাই দুঃখ।"

দুধসায়রের অনেক ঘাট। সব ঘাট ব্যবহার হয় না। সেরকমই একটা অব্যবহৃত ঘাটে একটা ডিঙি নৌকো বাঁধা। পরেশবাবু সাবধানে ডিঙির ওপর শুলটা শুইয়ে রাখলেন। তারপর জগার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, “যাও, গিয়ে ঘুমোও। কাল সকালে ওই টাকা দিয়ে জিলিপি খেয়ো।”

কিন্তু জগাপাগলার হঠাৎ যেন কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল। টাকাটা হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ জগা চেঁচিয়ে উঠল, “মোটেই ওটা ভূতযন্ত্র নয়! ওটা বন্দুক। আপনি আমাকে দিয়ে খুন করালেন পরেশবাবু?”

পরেশবাবু একগাল হেসে বললেন, “কেন, খুন করে তোমার ভাল লাগছে না? একটা খুন করতে পারলে আমার কত আনন্দ হত জানো?”

জগা হঠাৎ পরেশবাবুকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠল,

“আপনাকে আমি ছাড়ব না। পুলিশে দেব।”

ঠিক এই সময়ে পেছনের অন্ধকার থেকে একজন লম্বা, খুব লম্বা লোক এগিয়ে এল। তার হাতে উলটো করে ধরা একটা পিস্তল। লোকটা পিস্তলটা তুলে তার ভারী বাঁটটা দিয়ে সজোরে জগার মাথার পেছনে মারল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল জগা। লোকটা জগার দেহটা টেনে ঘাটের আগাছার জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল।

তারপর দুজনে চটপট হাতে বৈঠা মেরে তীর গতিতে বাতাসা দ্বীপের দিকে এগোতে লাগল।

৮. গাঁয়ের লোকজন এসে রাজবাড়িতে হাজির

একটু বাদে যখন গাঁয়ের লোকজন এসে রাজবাড়িতে হাজির হয়ে রামুয়া আর হরুয়ার অবস্থা দেখল তখন সকলেই 'হায়! হায়! করতে লাগল। রসময় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গগনবাবুকে বললেন, "নির্দোষ পাগলটা খুনের দায়ে এবার না ফাঁসিতে ঝোলে!"

গগনবাবু টর্চের আলোয় ভাল করে হয়া আর রামুয়াকে দেখে বললেন, "ভয় নেই, এদের কারও গায়ে স্টেনগানের গুলি লাগেনি, মরেওনি। মনে হচ্ছে আনাড়ি হাতে এলোপাথাড়ি গুলির ঘায়ে দেউড়ির বাতিদানটা খসে হয়ার ঘাড়ে পড়েছিল। আর দেওয়ালের মস্ত চাবড়া খসে রামুয়ার মাথায় চোট হয়েছে। তবে চোট সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। দুজনেই শক্ত ধাতের লেক। কিছু হবে না।"

গগনবাবুর পিছু পিছু গাঁয়ের লোকেরা রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল, প্রতাপরাজার শূল হাওয়া।

গগনবাবু গম্ভীর গলায় মদন হাজরাকে বললেন, "মদনবাবু, এখনই একটা নৌকোর ব্যবস্থা করুন, আমাদের বাতাসা দ্বীপে যেতে হবে।"

"তার আর কথা কী? ওরে গুলবাগ সিং, শিগগির গিয়ে ছেলেদের ঠেলে তোল।"

গগনবাবু বললেন, "বেশি লোক যাওয়া চলবে না। শব্দ সাড়া হলে মুশকিল হবে। শুধু আপনি, আমি আর রসময়বাবু যাব, আর গুলবাগ সিং।"

একটু বিবর্ণ মুখে মদন হাজরা বললেন, "ইয়ে, তা বেশ কথা। কিন্তু গগনবাবু, ওদের কাছে যে স্টেনগান আছে।"

“তা থাক। আমাদের একটু ঝুঁকি নিতেই হবে। আপনার আর আমার দুজনের পিস্তল আছে। তেমন হলে পালটা গুলি চালানো যাবে। চলুন।”

ঘণ্টাখানেক বাদে একটি ডিঙি নৌকো অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে বাতাসা দ্বীপের একটা আগাছায় ভরা পাড়ে লাগল। চারজন নিঃশব্দে নামলেন। টর্চ না জ্বেলে ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলেন তাঁরা।

দেখা গেল, বাতাসা দ্বীপটা গগনবাবুর একেবারে মুখস্থ। প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনের দিক দিয়ে গেলেন না গগনবাবু। চাপা গলায় বললেন, “উত্তরদিকে একটা জমাদার যাওয়ার দরজা আছে। সেটার খবর অনেকে জানে না।”

গগনবাবু টর্চ না জ্বেলেই ভাঙাচোরা রাস্তায় খোয়া, পাথর আর জঙ্গল ভেদ করে দরজাটার কাছে পৌঁছলেন। খুব সন্তর্পণে দরজাটা টানতেই ক্যাচ করে সামান্য ফাঁক হল।

গগনবাবু একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর ফের খুব সন্তর্পণে দরজাটা আবার টানলেন। আবার কাঁচ করে শব্দ। তবে মানুষ গলে যাওয়ার মতো পরিসর সৃষ্টি হল। প্রথমে মাথা নিচু করে গগনবাবু এবং পেছনে তিনজন ধীরপায়ে ভেতরে ঢুকলেন। সামনে জমাট অন্ধকার।

গগনবাবু ফিসফিস করে বললেন, “আলো জ্বালাবেন না। আমার পিছু পিছু আসুন। সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি আছে। তারপর হলঘর। হলঘর পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি।

হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অনেক সময় লাগল। সব কাজই করতে হচ্ছিল সন্তর্পণে। তা ছাড়া পুরনো ভাঙা বাড়িতে ইট-কাঠ-আবর্জনা এত জমে আছে যে, পা রাখাই দায়!

দোতলার চাতালে বুকসমান ইট-বালি-সুরকি জমে আছে। ভাঙা ছাদের একটা অংশ খসে পড়েছে এখানে। কোথায় যেন একটা তক্ষক ডেকে উঠল।

চাপা গলায় গগনবাবু বললেন, "ডাইনে। সাবধান, এখানে একটা জায়গা ভেঙে পড়ায় ফাঁক হয়ে আছে।"

এগোতে বাস্তবিকই কষ্ট হচ্ছিল। গগনবাবুর মিলিটারি ট্রেনিং আছে, আর কারও তা নেই।

অন্তত বিশ কদম গিয়ে ডানধারে একটা দরজার কাছে দাঁড়ালেন গগনবাবু। ঘরের ভেতরে ঘটাং-ঘটাং করে দুটো শব্দ হল। লোহার গায়ে লোহার শব্দ।

গগনবাবু সন্তর্পণে মুখটা বের করে দেখলেন, মস্ত শুলটা দেওয়ালের এক জায়গায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে দুটো লোক। তাদের একজন খুব, খুবই লম্বা। অন্তত সাড়ে সাত ফুট হবে।

হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে গগনবাবু বলে উঠলেন, "ক্ষেত্রী, আমি তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে ঠঙাত করে বিকট শব্দ হল। শুলটা ফেলে দিল হয়তো। আর তারপরেই ট্যারারারা... ট্যারা রারা... ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে লাগল খোলা দরজা দিয়ে।

রসময় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। মদন হাজরা বাপরে বলে চিৎকার দিয়ে, সিঁড়ির দিকে দৌড়তে গিয়ে ইট-বালির স্তূপে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। গুলবাগ দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে জোরে-জোরে দুগা দুর্গতিনাশিনী' জপ করতে লাগল।

শুধু অচঞ্চল গগনবাবু ঘাবড়ালেন না। পায়ের কাছ থেকে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে গুলির মুখেই আচমকা দরজা দিয়ে ভেতরে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন।

গুলির শব্দ থামল। ভেতরে কে যেন একটা কাতর আর্তনাদ করে ধপাস করে পড়ে গেল।

গগনবাবু ঘরে ঢুকে টর্চ জ্বাললেন।

দেখা গেল লম্বা লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে। দ্বিতীয় লোকটা হাতে পিস্তল নিয়ে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

গগনবাবু স্টেনগানটা তুলে গুলির ম্যাগাজিনটা খুলে নিলেন। তারপর দ্বিতীয় লোকটার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "কী ক্ষেত্রী, গুলি করবে নাকি? তা চালাও দেখি গুলি, কেমন পারো দেখি।"

ক্ষেত্রী পিস্তল তুলল, ট্রিগারে আঙুল রাখল, তারপর দাঁতে দাঁত চাপল, চোখ বুজল। কিন্তু গুলি করতে পারল না। তার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। শেষে সে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে বলল, "না, পারছি না! পারছি না।"

গগনবাবু এগিয়ে গিয়ে তার হাতের পিস্তলটা তুলে নিলেন। লোকটা বাধা দিল না।

দৃশ্যটা দেখে রসময় অবাক! হাতে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রী কেন গগনবাবুকে গুলি করল না সেটা বুঝতে পারলেন না তিনি।

গগনবাবু হাঁক দিলেন, "গুলবাগ সিং!"

গুলবাগ এবার বুক চিতিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, "বলুন সার।"

"এই ঢ্যাঙা লোকটার হাতে হাতকড়া পরাও।"

"বহুত আচ্ছা সার।" বলে গুলবাগ পটাং করে লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে বলল, "আর উনি?"

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "একে পরাতে হবে না।" তারপর ক্ষেত্রীর দিকে ফিরে গগনবাবু শুধু বললেন, "বিশ্বাসঘাতক! কাপুরুষ!"

মাঝবয়সী, গাঁটাগোট্টা চেহারার ক্ষেত্রী নামের লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বন্দুক-পিস্তলের মাঝখানে রসময় বড়ই অস্বস্তি বোধ করছেন। তবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "গগনবাবু, আপনার বড় দুঃসাহস। ওভাবে পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা আপনার উচিত হয়নি। লোকটা গুলি করলে কী যে হত।"

গগনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "রামলাল ক্ষেত্রীকে আপনি যদি চিনতেন তা হলে ওর পিস্তলের সামনে দাঁড়াতে আপনারও ভয় করত না।"

মদন হাজরা গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলেন। বললেন, "লোকটা কে গগনবাবু?"

"মিলিটারিতে আমার ব্যাটালিয়নেই চাকরি করত। কিন্তু ও একটি অদ্ভুত সাইকোলজিক্যাল কেস। মিলিটারি হয়েও জীবনে কোনওদিন কাউকে মারতে পারেনি, এমনকী, যুদ্ধের সময়েও না, মানুষ মারা তো দূরে থাক, একবার ফাঁদে পড়া একটা ইঁদুরকে মেরে ফেলতে বলেছিলাম ওকে। তাও পারেনি। তা বলে ওকে খুব অহিংস ভাববেন না যেন। নিজে মারতে পারে না বটে, কিন্তু অন্যকে দিয়ে খুন করাতে ওর আপত্তি তো নেই-ই, বরং আগ্রহ আছে। খুনখারাপি বরং ও ভালইবাসে এবং তা ঘটানোর জন্য সব আয়োজন করে দেয়। শুধু নিজে হাতে কাজটা করে না। যদি তা পারত তবে অনেক আগেই আমাদের উড়িয়ে দিত। সেটা পারেনি বলেই ও জগাপাগলাকে কাজে লাগিয়েছিল।"

"কিন্তু ওই ঢ্যাঙা লোকটা তো ছিল।"

ঢ্যাঙা লোকটা থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। গগনবাবু তার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "একেও আমার খুব বলবান বা সাহসী বলে মনে হচ্ছে না। বরং সন্দেহ হচ্ছে, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের গণ্ডগোলে হঠাৎ ঢ্যাঙা হয়ে গিয়ে অসুবিধেয় পড়ে গেছে শরীরটা নিয়ে। কী হে ক্ষেত্রী, ঠিক বলছি?"

ক্ষেত্রী মৃদুস্বরে বলল, "হ্যাঁ, সার, ঠিকই বলছেন। ও আমার মাসতুতো ভাই ধরণী। হঠাৎ-হঠাৎ দু-একটা সাহসের কাজ করে ফেলে বটে, নইলে যেমন ভিতু তেমনই অপদার্থ। শরীরটাও বড় লগবগে, বছরের মধ্যে আট-ন মাসই অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।"

রসময়বাবু এবার হাতজোড় করে বললেন, "গগনবাবু, এবার ঘটনাটা ভেঙে বলবেন? মনে হচ্ছে আপনি এই ঘটনার আদ্যোপান্ত জানেন।"

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ জানি। শুধু জানি বললে সবটা বলা হবে না। আমিই এই ঘটনার পালের গোদা।"

"তার মানে?"

গগনবাবু মৃদু হেসে বললেন, "সবটা না বললে কি বুঝবেন?"

"সবটাই বলুন।"

"আমি যখন ছোট ছিলুম তখন এই বাতাসা দ্বীপের রাজার বাড়ি আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। অনেকের মতো আমারও মনে হত, বোধ হয় রাজবাড়িতে গুপ্তধন আছে। তাই প্রায়ই এসে আমি এখানে-ওখানে গর্ত করে দেখতাম। একদিন আমার হঠাৎ খেয়াল হল, রাজবাড়ির দেওয়ালগুলো খুব পুরু বটে, কিন্তু পশ্চিমদিকে দোতলার এই ঘরের দেওয়ালটা যেন আরও অনেকটা বেশি পুরু। টেপ দিয়ে মেপেও দেখলাম, আমার অনুমান সত্যি। তখন একদিন নিশুত রাতে একা এসে দেওয়ালের চাপড়া ভাঙতে লাগলাম। খুব শক্ত আস্তরণ ছিল, ভাঙতে রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হয়েছিল আমায়। প্রায় ছ ইঞ্চি পুরু আস্তরণ সরিয়ে দেখি, ভেতরে একটা লোহার সিন্দুকমতো রয়েছে। চাবির ছিদ্রটা দেখে আমি অবাক! এত বড় ফুটোর চাবিও বিরাট বড় হওয়ার কথা। শুধু মুখটাই বড় নয়, ছিদ্রের মধ্যে একটা শলা ঢুকিয়ে দেখেছি খুব গভীরও বটে। সিন্দুক তো পাওয়া গেল, কিন্তু এর চাবি কোথায় পাওয়া যায়? চাবি না পেলে 'গ্যাস কাটার' দিয়ে কাটতে হয়।

কিন্তু আপনাদের আগেই বলে রাখছি, আমার গুপ্তধন গাপ করার মতলব ছিল না। আমি চোর নই, কৌতূহলী মাত্র।”

রসময় বললেন, “সে আমরা জানি। নইলে অনেক আগেই আপনি গুপ্তধন সরিয়ে ফেলতে পারতেন।”

“ঠিক কথা। যাই হোক, আমি ভাঙা জায়গাটা সারারাত জেগে আবার মেরামত করি। পাছে লোকে বুঝতে পারে সেই ভয়ে পুরনো চুনবালি লাগিয়ে তার ওপর ঝুলকালি ভরিয়ে দিই। তারপর চাবিটার কথা চিন্তা করতে থাকি। এত বড় চাবি প্রতাপরাজা কোথায় রাখতে পারেন! হরুয়ার কাছে যেসব চাবি আছে সেগুলো বড় বটে, তবে এত বড় নয়। রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকেও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। রাজবাড়িতে জিনিসপত্র বলতে তো কিছুই এখন নেই। রাজা মহাতাবের আমলেই সব বিক্রি হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে আছে শুধু অস্ত্রাগারটা। তা সেখানে খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ শুলটার ওপর আমার চোখ পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়। শুলটার চোখা দিকটায় কিছু অদ্ভুত ধরনের খাঁজ কাটা আছে। আমি চাবির ছিদ্রের মাপ এবং নকশা নিয়ে রেখেছিলাম। মিলিয়ে দেখলাম, হুবহু মিলে গেল।

মদন হাজরা অবাক হয়ে বললেন, “তাও কিছু করলেন না? এতদিনে তো রাজা হয়ে যেতে পারতেন মশাই।”

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “না, পারতাম না। রাজা প্রতাপের বৈধ ওয়ারিশন আছেন। তিনি আমেরিকায় থাকেন, নাম মহেন্দ্র। আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানাই। তিনি আমাকে জবাবে লিখলেন, তাঁর দেশে ফেরার আশু সম্ভাবনা নেই। যদি কখনও ফেরেন তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন। আসলে মহেন্দ্র ওখানে ব্যবসা করে প্রচুর টাকা করেছেন। গুপ্তধন তাঁকে টানেনি। আর গুপ্তধন কিছু আছে কি না তাও তো অজানা।”

মদন হাজরা উত্তেজিত হয়ে বললেন, “খুলে দেখলেই তো হয়।”

গগনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "না, হয় না। ওটা আমাদের অনধিকার হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে মদনবাবু।"

"তা বটে!"

"আমি একটাই ভুল করেছি। কাশ্মিরের উত্তরে একটা ভীষণ দুর্গম জায়গায় পোস্টিং-এর সময় এই রামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে আমার চেনা হয়। আমার খুব দেখাশুনো করত। একদিন খুব দুর্যোগের রাতে ছাউনিতে বসে গল্প করতে করতে এই ঘটনাটা বলে ফেলি। তখন কল্পনাও করিনি যে, রামলাল ক্ষেত্রী এই অজপাড়াগাঁ খুঁজে বের করে গুপ্তধন বাগাবার চেষ্টা করবে। শুধু তাই নয়, সাক্ষী প্রমাণ লোপ করার জন্য আমাকেও ধরাধাম থেকে সরাতে চাইবে। লোভ যে মানুষকে কোথায় টেনে নামাতে পারে, ভেবে শিউরে উঠছি। এবার থেকে বাতাসা দ্বীপেও পাহারা বসাবার ব্যবস্থা করতে হরুয়াকে বলতে হবে। ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।"

সবাই নির্বাক হয়ে রইল।

.

দুধসায়রের এক আঘাটায় খুব ভোরবেলা চোখ মেলে চাইল জগা। মাথাটা টনটন করছে বড্ড। চারদিকে ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে সে পড়ে আছে কেন, তা প্রথমে বুঝতে পারল না। তারপর ধীরে-ধীরে সে উঠে বসল এবং সব ঘটনাই তার মনে পড়ে গেল। সে হঠাৎ টের পেল, তার স্মৃতিশক্তি ঝকঝক করছে এবং পাগলামির চিহ্নমাত্র আর তার মাথায় নেই। ভারী স্বাভাবিক লাগছে তার। তবে মনটা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন। সে ধীরে ধীরে উঠল। ভাবল, থানায় গিয়ে নিজের অপরাধ কবুল করে ধরা দেয়।

তা গিয়েছিল জগা। কিন্তু মদন হাজরা তাকে পাত্তাই দিলেন না। বললেন, "যাও, যাও, ওসব ছোটখাটো অপরাধের জন্য গ্রেফতারের দরকার নেই। আসল কালপ্রিট যে ধরা পড়েছে এই ঢের।"

বিকেলে গগনবাবুর বাড়িতে গাঁয়ের মেলা লোক জড়ো হয়েছে। ঘটনা নিয়ে তুমুল উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছে। এমন সময়ে রামহরিবাবু শশব্যস্ত এসে ঢুকলেন। গলায় খুব উদ্বেগ। বললেন, "ও গগনবাবু, শুনছি নাকি আমাদের জগাপাগলার পাগলামি সেরে গেছে!"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে সেরে গেছে।"

রামহরিবাবু ডবল উদ্বেগের গলায় বললেন, "তা হলে তো চিন্তার কথা হল মশাই! গাঁয়ে মোটে ওই একটিই পাগল ছিল, সেও যদি ভাল হয়ে যায় তা হলে কী হবে? পাগল ছাড়া গাঁ যে ভারী অলক্ষুনে!"

সবাই হাসতে লাগল।